সংগঠন ও বাঙালি

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

সংগঠন ও বাঙালি

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

মাওলা ব্রাদার্স

প্রকাশনার সাত দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© লেখক
তৃতীয় মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ২০১৪
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৮০৭৭১ ৯৫৬৮৭৭৩
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন ঢাকা ১১০০

দাম
একশত ষাট টাকা মাত্র

ISBN 984 70156 0157 7

SONGGOTHON O BANGALEE (a collection of articles) by Abdullah Abu Sayed. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Dhruba Esh. Price : Taka One Hundred and Sixty only.

উৎসর্গ

'প্রথম আলো'র সম্পাদক

মতিউর রহমান

যাঁর সাংগঠনিক প্রতিভা ও
দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা
আমাকে প্রজ্বলিত করে

ভূমিকা

বাঙালির ইতিহাস এক দীর্ঘ পরাধীনতার ইতিহাস। কেবল দীর্ঘ নয় প্রায় বিধিলিপির মতো নিষ্কৃতিহীন এ-পরাধীনতা। ইতিহাসের কোনো পর্বে আমাদের স্বশাসনের নজির নেই। কখনো এদেশে চলেছে পালদের শাসন, কখনো সেনদের, কখনো পাঠানদের, কখনো মোগলদের, কখনো ব্রিটিশদের, কখনো পাকিস্তানিদের। সব যুগেই অন্যেরা এই দেশকে অধিকার করেছে, ভোগদখল ও লুটপাট করেছে। তারাই ছিল আমাদের ভাগ্যের নিয়ন্তা। নিজেদের ভাগ্য কখনোই আমরা নিজেরা নির্ধারণ করার সুযোগ পাইনি। পাইনি বলে আমাদের জাতির মৌলিক সংগঠনগুলোও গড়ে উঠতে পারেনি। হয় আমাদের জাতির দরকারি সংগঠনগুলো প্রথম থেকেই দুর্বল ছিল বলে আমরা বহিরাগতদের পদানত হয়ে পড়েছিলাম নয়তো একবার পদানত হয়ে পড়েছিলাম বলে ঐ সংগঠনগুলো আর গড়ে ওঠেনি।

একটা জাতির সংগঠনগুলো যত শক্তিশালী, সেই জাতি তত শক্তিশালী। আমাদের জাতির সংগঠনের জগৎটা খুবই দুর্বল। এটাই জাতি হিশেবে আমাদের দুর্বলতার মূল কারণ। জাতিগতভাবে সমর্থ হয়ে উঠতে হলে এই দুর্বলতা আমাদের কাটিয়ে উঠতেই হবে।

১৯৭১ সালে ঘটেছে আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা : স্বাধীনতা। এই প্রথমবারের মতো নিজেদের ভাগ্য নির্মাণের অধিকার আমরা নিজেরা পেয়েছি। অজস্র দক্ষ সংগঠন গড়ে তোলার ভেতর দিয়ে জাতীয় ভাগ্যকে আজ আমাদের সুদৃঢ় করতে হবে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে পরাধীন থাকার ফলে আমাদের জীবনের মধ্যে এমন কিছু দুর্বলতা, অক্ষমতা, সংকীর্ণতা ও আত্মসর্বস্বতা জেঁকে বসে গেছে যে তা দিয়ে সুযোগ্য সংগঠন গড়ে তোলা,—অস্তিত্বের ও বিকাশের বড় আয়োজনে এগিয়ে যাওয়া—আমাদের পক্ষে সহজ হচ্ছে না। আমাদের জাতির অধিকাংশ মানুষের ব্যক্তিগত যোগ্যতার অভাবও একে আরও প্রকট করে তুলেছে। ফলে ছোট বড় সংগঠন থেকে আরম্ভ করে আমাদের রাষ্ট্রীয় সংগঠনও আজ পর্যন্ত নানারকম অব্যবস্থা আর নৈরাজ্যের শিকার। কী কী কারণে আমরা সংগঠন গড়ে তুলতে

পারছি না, এর ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক, ভৌগোলিক ও শারীরিক কারণগুলো কী কী—এসব বিষয় আমি যা শাদা চোখে দেখে বুঝেছি, তা এই বইয়ে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। গত তিন দশকে স্বাধীনতার মুক্ত ও বাধাবন্ধনহীন পরিবেশে আমাদের দেশে যে হাজার হাজার সংগঠন গড়ে উঠতে শুরু করেছে সেগুলোকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার জন্য নিজেদের শক্তির পাশাপাশি আমাদের দুর্বলতাগুলোও আজ চিনে নেওয়া আমাদের জন্যে জরুরি। তা হলেই কেবল আমরা অক্ষমতার ঊষরতা এড়িয়ে অসংখ্য শক্তিশালী সংগঠনের ভেতর দিয়ে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ও জাতিকে গড়ে তুলতে পারব। আমি এ-বইয়ে আমাদের সেই দুর্বলতাগুলো খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছি। কী করে সেগুলোকে অতিক্রম করা যায় তা ভাবার চেষ্টা করেছি।

সংগঠন আমাদের জীবনে একটা নতুন জিনিশ। এ নিয়ে তাই আজ ব্যাপক ও শ্রমসাধ্যভাবে এ-জাতিকে ভাবতে হবে। খুবই অস্ফুট, অসম্পূর্ণ ও অযোগ্যভাবে আমি, হয়তো প্রথমবারের মতো এই ছোট্ট বইটির মাধ্যমে এ-ব্যাপারে কিছুটা ভাবনা তুলে ধরলাম। আশা করি অচিরেই আমার চেয়ে উন্নত মেধা ও মননসমৃদ্ধ মানুষেরা তাঁদের জ্ঞান আর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এই বিষয়টিকে আরও আলোকিত করতে এগিয়ে আসবেন।

আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে সুলেখক মঈনুল আহসান সাবের তার প্রকাশনা 'দিব্যপ্রকাশ' থেকে এই বইটি প্রকাশে এগিয়ে এসেছে। সেজন্যে তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সে আমার ছাত্র। কাজেই ভালোভাবেই সে গুরুদক্ষিণা দিয়েছে বলে ধরতে হবে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আলাউদ্দিন সরকারের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। তার অতন্দ্র সহযোগিতা ছাড়া বইটি প্রকাশ করা কঠিন হত।

ঢাকা
৩০ ডিসেম্বর ২০০২

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের হল। বইটিকে পাঠকেরা যতটা প্রত্যাখ্যান করবেন বলে আশঙ্কা করেছিলাম ততটা প্রত্যাখাত হয়নি। অনেকে বইটি সামগ্রিক পছন্দ করেছেন। অনেকে অনেক বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়েছেন। বইটিকে নতুন করে লেখার ইচ্ছা ছিল। বরাবরের মতো সময়ের অভাবে তা সম্ভব হল না। সামান্য পরিমার্জনা করেই এবারের মতো দায় শোধ করলাম।

ঢাকা
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

সূচিপত্র

বাঙালির সাংগঠনিক দুর্বলতা ৯
বাঙালির সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণ আত্মপরতা ১৮
বাঙালির সাংগঠনিক দুর্বলতার আরও কারণ : ব্যক্তিগত অসহায়তা, অক্ষমতা, হীনমন্যতা ও আত্মঘাত ২৮
সাংগঠনিক ব্যর্থতার মৌলিক কারণ : স্বাস্থ্যগত দুর্বলতা! ৪৬
কেন আমাদের স্বাস্থ্য বা কর্মক্ষমতা নিচুমানের? ৬১
আমাদের সরকার-পদ্ধতির রূপরেখা ৬৯
সংসদীয় বনাম রাষ্ট্রপতিপদ্ধতির গণতন্ত্র ৭২
আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর রূপরেখা ৭৬
সংগঠনের উত্তরাধিকার ৭৮

বাঙালির সাংগঠনিক দুর্বলতা

১

আমি অতিরিক্ত কবিতাপাঠের দ্বারা বিনষ্ট মানুষ। আলসেমি আর দায়িত্বহীনতা আমার অস্থিমজ্জায়। এ-জগতে কোনোকিছু না করতে হলে কিংবা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দিনরাত আড্ডা দিয়ে জীবন উড়িয়ে দিতে পারলে আমি সবচেয়ে সুখী হতাম।

কেবল তাই নয়। শিশুকাল থেকে আমি এক জন্মগত অসহায়তার শিকার। শক্তপোক্ত মানুষ বলতে যা বোঝায় আমি তার ঠিক উল্টো। বাজার করা, ঘর গোছানো, সময় ধরে ওষুধ খাওয়া বা নিজের জিনিশপত্রের সামান্য পরিমাণে দেখভাল করা—এমনি যা-কিছু একজন মানুষকে এই পৃথিবীতে নিতান্তই বাঁচার জন্যেই করতে হয় আমি সেটুকুও প্রায় পারি না। এর ওপর, গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো, আরও একটা বিরাট অক্ষমতা রয়েছে আমার ভেতরে। আমার চেয়ে বোকা মানুষ আমি জীবনে কিছু কিছু দেখলেও আমার চেয়ে স্মৃতিশক্তিহীন মানুষ প্রায় দেখিনি। কোথায় কখন কী রাখলাম, কোথায় কী ফেলে গেলাম, কে আমাকে কখন কী দিল, কে কী নিয়ে গিয়েছে এর কোনোকিছুই আমি মনে রাখতে পারি না। কিন্তু এ সবকিছুকে ছাপিয়ে যে-বেদনাদায়ক ব্যাপারটি আমার জীবনকে তার অশুভ ও অপ্রতিহত সাম্রাজ্য করে রেখেছে তা হল আজন্মকালীন এক অন্তর্গত ভয় এবং অসহায়তার অনুভূতি। সামান্য কষ্টকর কিছু করতে হবে বুঝলে আমি প্রায় ভেঙে পড়ি, কীভাবে তা করব কিছুতেই ভেবে পাই না। সেগুলো করার মতো চেনা অচেনা কোনোরকম শক্তির উৎসই খুঁজে পাই না নিজের ভেতরে। এই অসহায়তার অনুভূতি আমার ভেতর-যে কতটা তা একটা ছোট গল্প বলে বোঝানোর চেষ্টা করি। গল্পটা আমি আমার একটা বইয়ে লিখেছি :

> "আমি যখন কলেজের একাদশ শ্রেণীতে পড়ি তখন একবার আমাকে মাসখানেকের জন্যে কলেজ থেকে পৌনে এক মাইল দূরে একটা বাসায় থাকতে হয়েছিল। বাসা থেকে কলেজে আসতে হত একটা ছায়াঢাকা সরু মেঠো পথ দিয়ে। পথের এক অংশে

দশ-পনেরো হাত জায়গা ফুটখানেক পানির নিচে। জুতো খুলে পানি ভেঙে সে-জায়গাটা পার হতে হত। ঐ পানির সামনে এসে প্রতিদিন আমার চোখে পানি এসে যেত। আমি প্রায় কাঁদতে থাকতাম। কীভাবে এই বিশাল অন্তহীন সমুদ্র পায়ে হেঁটে পার হব কিছুতেই ভেবে পেতাম না।"

এই সময় আমার বয়স ছিল সতেরো। ঐ বয়সে সম্রাট আকবর বৈরাম খানকে বিদায় করে রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে তুলে নিয়েছেন এবং আলেকজান্ডার পৃথিবী জয়ের পরিকল্পনা শেষ করে ফেলেছেন।

এই হলাম সত্যিকার 'আমার আমি'। এ ছাড়াও, আগেই বলেছি, ছেলেবেলা থেকে অবিশ্রান্ত কবিতাপাঠের ফলে আমার যুগের বঙ্গসন্তানেরা যেভাবে অধঃপাতে যেত আমি মোটামুটি তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এরকম একজন মানুষের পক্ষে এই পৃথিবীতে আর যাই হোক সংগঠন গড়ে তোলা খুবই দুরূহ হওয়ার কথা। অথচ তাই আমি করেছি। খুব বড় প্রতিষ্ঠান না হলেও মাঝারি আকারের একটি সংগঠন গড়ে তুলেছি। আমার ধারণা ছোট বড় যাই হোক যে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই প্রায় একইরকম কঠিন যদি তা সততা দিয়ে গড়ে তোলা হয়। সব প্রতিষ্ঠানের জন্যে প্রায় সমান রক্তাহুতিই দিতে হয় প্রতিষ্ঠাতাদের। (হয়তো ছোট প্রতিষ্ঠানের জন্যে আরও বেশি দিতে হয়।) অপরিসীম কষ্টে-দুঃখে অজগ্রামের কোনো স্কুল প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে ঢাকায় একটা বড়সড় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তৈরি করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সময়, অবস্থান, আদর্শ বা মেধার পরিমাণ বা সুযোগসুবিধার কমবেশির কারণে সেগুলো বড় বা ছোট হয়। তাহলে ধরতে হবে যে, একটি বড় প্রতিষ্ঠান তৈরির সমান দুঃখকষ্টের বোঝাই আমাকে বইতে হয়েছিল। জীবনের ওপর দিয়ে নিগ্রহও কম যায়নি। তবু আমি পেরেছিলাম। পেরেছিলাম মানে পারতে হয়েছিল। যে-কারণে রামমোহনকে ধর্মসভা প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল, বিদ্যাসাগরকে পাঠ্যবই লেখায় বা সামাজিক আন্দোলনে নামতে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বভারতী গড়ে তুলতে হয়েছিল, বেগম রোকেয়াকে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল করতে হয়েছিল; আমাকেও যত সামান্য মানেই হোক, আমার প্রতিষ্ঠান বানাতে হয়েছিল। তাঁদের মতোই যুগের দাবির উত্তর দেবার জন্যেই করতে হয়েছিল এটা। এ যে আনন্দে খলখল করতে করতে আমি করেছিলাম, তা নয়। এর চেয়ে ঢের ঢের প্রিয় কাজ ফেলেই আমি এটা করেছিলাম। করেছিলাম বিবেকের দায়িত্ব হিসেবে। খুব আনন্দ পাইনি তবু করেছি। করেছি এইজন্য যে আমার যুগ এই দাবি নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাকে অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই পৃথিবীতে মানুষ যা করে তা শেষপর্যন্ত হয়তো করে তার যুগের দাবি মেটানোর জন্যেই। সারা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে বাঙালির যেমন চলেছিল ধর্মের যুগ, উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশ শতকের চল্লিশের দশক পর্যন্ত যেমন চলেছিল কবিতার যুগ,

সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত যেমন ছিল আমাদের জাতীয়তাবোধের যুগ; তেমনি একাত্তরের পর থেকে আমাদের চলছে সংগঠনের যুগ।

১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে জন্ম নিয়েছি। একটি জাতি অসংখ্য ছোট বড় সংগঠনের যোগফলের নাম। এই সংগঠনগুলো সংখ্যায় যত বেশি হবে এবং শক্তিতে যত অপরাজেয় হবে ঐ জাতিও হবে তত অপ্রতিরোধ্য। এই সংগঠনগুলো আমাদের জাতির মধ্যে ছিল না। না-থাকারও কারণ অনেক। ১৯৭১ সালের আগে বাঙালি কোনোকালে স্বাধীন ছিল না। এই সময়কার সবখানি ইতিহাস পুরোপুরিই এক নিরবচ্ছিন্ন পরাধীনতার ইতিহাস। কখনো পালেরা আমাদের শাসন করেছে, কখনো সেনেরা, কখনো মোগল, কখনো পাঠান, কখনো ব্রিটিশ, কখনো পাকিস্তান। হয় আমাদের মধ্যে শক্তিশালী সংগঠন ছিল না বলে তারা আমাদের অতি সহজে পদানত করে ফেলতে পেরেছিল। নয়তো তারা পদানত করে ফেলেছিল বলে আমাদের জাতির সাংগঠনিক প্রতিভা আর বিকশিত হতে পারেনি।

স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণতা দেবার দরকারে সারাদেশের সবখানে অসংখ্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ব্যবসায়িক ও অন্যান্য ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সাংগঠনিক প্রয়োজনের পথ ধরে সারাদেশে হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান তৈরি হতে শুরু করে। এই প্রবণতা আরও কয়েক দশক ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে বহমান থাকবে বলে আমার ধারণা। গত তিরিশ বছরে এই প্রবণতার পথ ধরে এই দেশে এমন সব বিশাল ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে এমন কিছু এন.জি.ও. যাদের দুয়েকটি রীতিমতো বিশ্বমাপের। সংগঠনের ইতিহাসহীন একটি দেশে কী করে রাতারাতি এমন একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটতে পারল তা সত্যি সত্যি বিস্ময়ের। তবু অভাবিত হলেও কেন তা সম্ভব হল তা আমি এই লেখার অন্য এক জায়গায় বলার চেষ্টা করব। দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের উৎকণ্ঠাবান ও সচেতন মানুষেরা বেদনার সঙ্গে লক্ষ করেছিলেন যে বিশাল জনগোষ্ঠী-অধ্যুষিত এই দেশটির আগাপাশতলা কোটি কোটি দুঃখ ও সমস্যায় আকীর্ণ। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলেও আমাদের দেশের সজাগ মানুষেরা দেশের এই নিঃস্বতার দিকটি সহজাতভাবেই টের পেয়েছিলেন, কিন্তু নানান বাস্তব প্রতিকূলতার কারণে এর বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেননি। দেশের স্বাধীনতা আমাদের উদ্যমশীল মানুষদের সামনে সেই সুযোগের সোনালি দরোজা মেলে ধরেছে। স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে কেবলমাত্র সংগঠন নির্মাণের মাধ্যমেই জাতীয় জীবনের এইসব দুঃখ, সমস্যা ও নৈরাজ্যের উত্তর দেওয়া সম্ভব। তাই হাজার হাজার সংগঠন গড়ে তোলার ভেতর দিয়ে আমাদের দেশের বেদনাবিদ্ধ মানুষেরা ঐসব দুঃখের প্রতিকারের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। জাতি হিশেবে আজ আমরা টিকব কি না, টিকলে কতটা সমৃদ্ধি অর্জন করব তা এইসব সংগঠনের সাফল্য-ব্যর্থতার ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। সংগঠন আজও এ জাতির অনিবার্য বিধিলিপি।

এছাড়া আমরা অস্তিত্বহীন। আজ দেশ বা সমাজের প্রতি আমাদের যা-কিছু বক্তব্য, যা-কিছু কথা তা কেবল সংগঠনের ভাষাতেই প্রকাশ্য। এজন্যে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান—এমনি প্রায় সবকিছুই আজ জাতির জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে, বেঁচে আছে সংগঠন। সারা জাতির জীবনকে আচ্ছন্ন করে স্বয়ম্ভূ ঈশ্বরের মতো জেগে আছে।

২

আমি নিজে শিক্ষক। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার নিচু মান ও এর অর্থহীনতা অনেকদিন পর্যন্ত আমাকে হতাশাগ্রস্ত করে রেখেছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর ছাত্রদের কোনো সম্পন্ন ভবিষ্যতের ছবিই আমি দেখতে পাইনি। আলোহীন বিচ্ছুরণহীন ও অকর্ষিত সেই শিক্ষাব্যবস্থার অন্ধকারের ভেতর আমার নিজের শিক্ষকজীবনকেও আমার কাছে পুরোপুরি অর্থহীন বলে মনে হয়েছে। ব্যাপারটা বহুদিন আমাকে গভীর বেদনা দিয়েছে। এই নিঃস্ব পরিবেশের ভেতর বাস করে আমি একটা সৃজনশীল, কল্পনাসমৃদ্ধ ও আনন্দময় শিক্ষা-পরিবেশের স্বপ্ন দেখেছি। মনে হয়েছে এমন একটা রুচিস্নিগ্ধ অনাবিল আনন্দভুবনে আমাদের ছেলেমেয়েদের গড়ে তোলা গেলে এই ছেলেমেয়েদের সুপ্ত সম্ভাবনাকে হয়তো বিকশিত করা যেত। আমি যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর বা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার মানুষ হতাম তবে হয়তো এইসব বেদনা এবং স্বপ্নগুলো নিয়ে পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু আমি তা করিনি। এর প্রতিকারের লক্ষ্যে আমি সরাসরি সংগঠন তৈরির কথা ভেবেছি। সংগঠনের ভাষায় এই সংকটের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি। এটা ঘটেছে যুগের প্রভাবে। আমার যুগ সংগঠনের মধ্যে দিয়ে জাতীয় সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখছে। আমিও সেই কুচকাওয়াজে পা মেলাতে চেষ্টা করেছি।

আমাদের সংগঠনটি গড়ে উঠেছে খুব ধীরে ধীরে, পুরোপুরি দেশের ভেতর থেকে। ফলে সংগঠন তৈরির অসুবিধা বা সমস্যা কী কী তা একটু একটু করে আমার চোখে স্পষ্ট হয়েছে। অনেকদিন লেগেছে এতে। সংগঠনের কোনোরকম অভিজ্ঞতা এর আগে আমার ছিল না। ফলে ব্যবস্থাপনাশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা পাওয়া মানুষদের মতো বইপত্র পড়ে এই খুঁটিনাটি শেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি, প্রতিপদে নিজের জিভ পুড়িয়েই কেবল এর সবকিছু টের পেতে হয়েছে। প্রথমেই আমার মনে হয়েছে কোনো-একটা বড় কাজ করার জন্যে কিছু মানুষের সুপরিকল্পিত ও সংঘবদ্ধ চেষ্টাই হল সংগঠন। কাজ একা একাও করা যায়, কিন্তু একা একা করার একটা পরিমাণগত সীমা আছে। তার সুফল বেশি মানুষ পায় না। পাওয়াতে গেলে ওই একই মাপের আরও অনেক মানুষ দরকার হয়ে পড়ে।

ধরা যাক, হেনরি ফোর্ডের কথা। বিশ শতকের শুরুতে উনি যখন প্রথম আধুনিক মোটরগাড়ি বের করলেন তখন একা যদি তাঁকে ওই গাড়িগুলো উৎপাদন করতে হত তবে বছরে তিনি হয়তো সবমিলে গোটা পাঁচেক গাড়ি তৈরি করতে পারতেন। এর চেয়ে বেশি বানাতে গেলে প্রতি পাঁচটি গাড়ির জন্যে তাঁর কাছাকাছি মেধার একজন করে লোক দরকার হত। কিন্তু সংগঠন বানানোর ফলে এত মেধাবী লোক তাঁর দরকার হয়নি। তিনি তাঁর সঙ্গে কিছু মাঝারি মাপের মানুষ ও হাজার হাজার সাধারণ শ্রমিক নিয়ে এর চেয়ে বহুগুণ বেশি গাড়ি উৎপাদন করতে পেরেছেন। এতে তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থ, মেধা, প্রশাসনিক ঝামেলার অপচয় থেকে-যে শুধু বেঁচেছেন তাই নয়, লাভও করেছেন বিপুল এবং তাঁর পণ্য কম দামে সরবরাহ করতে পেরে তাঁর গাড়িকে বিপুলসংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছেন।

একটা সংগঠন সফল হয় কয়েকটা কারণে। এক. ওই সংগঠনের কর্মীদের সামনে একটি উজ্জ্বল ও অর্থপূর্ণ লক্ষ্য তুলে ধরতে পারলে; দুই. সেই লক্ষ্যের দিকে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বপ্নময়ভাবে জাগিয়ে তুলতে পারলে; তিন. এই উদ্যোগকে সক্রিয় রাখার মতো বস্তুগত সহযোগিতা নিশ্চিত করতে পারলে; চার. (আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলে) কর্মীদের সামনে লাভের মুলো উঁচিয়ে রাখতে পারলে। এসবের সহযোগে ওই কর্মীদলকে সুষ্ঠু উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হলে যে অবিশ্বাস্য ফল পাওয়া যায় তা এর বহু বহুগুণ বিচ্ছিন্ন মানুষের আলাদা চেষ্টা দিয়ে অর্জন করা সম্ভব নয়।

সংগঠনের প্রবণতা কিছু কিছু প্রাণীর ভেতর অস্ফুটভাবে দেখা দিলেও এর পরিপূর্ণ ও বিকশিত রূপটি দেখা যায় মানুষের মধ্যে। একা মানুষ খুবই অসহায়। জন্মগতভাবেও সে অন্যান্য অনেক প্রাণীর চেয়েই দুর্বল। সদ্যোজাত গো-শাবক মায়ের পেট থেকে পড়েই দৌড় দেবার জন্যে আকুপাকু করতে থাকে কিন্তু জন্মের পর অসহায় মানবশিশুকে দু-বছর পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টা বুকে আঁকড়ে রাখতে হয়, এক মুহূর্তের এদিক-ওদিক হলে সে হারিয়ে যায়। এমন অসহায় একটি প্রাণী-যে প্রাণিজগতের ওপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে তা সম্ভব হয়েছে এই সংগঠনের কারণেই। সংঘবদ্ধতার একটা বিস্ময়কর শক্তি রয়েছে মানুষের মধ্যে। এই প্রবণতা তার ভেতরকার জৈবিক প্রবৃত্তির চেয়ে কম শক্তিশালী নয়। নিকোলাই গোগোলের 'তারাস বুলবা' উপন্যাসে তারাস বুলবা তাঁর সঙ্গীদের বুঝিয়ে বলেছিলেন :

"সাথীত্বের চেয়ে পবিত্রতর কিছুই নেই! বাপ ভালোবাসে তার সন্তানকে, মা ভালোবাসে তার সন্তানকে, সন্তান ভালোবাসে তার মা-বাবাকে। কিন্তু এ অন্য জিনিশ, ভাইসব : জন্তুরাও ভালোবাসে তাদের বাচ্চাদের। কিন্তু কেবল রক্তের নয়, অন্তরের আত্মীয়তা, এ আছে কেবল মানুষের।"

ছেলেবেলার পাঠ্যবইয়ে আমরা একটা কবিতা পড়তাম। তার কয়েকটা লাইন ছিল এরকম :

একটি লতা ছিঁড়তে পারো তোমরা সকলেই,
কিন্তু যদি দশটা লতা পাকিয়ে এনে দেই,
তখন তারে ছিঁড়ে ফেলা নয়তো সহজ কাজ,
ছিঁড়তে গেলে পাগলা হাতি হয়তো পাবে লাজ।

এই-যে 'দশটা লতা পাকিয়ে এনে দেই'—এই পাকানোটাই হল সংগঠন। মানবসংঘকে একবার ঠিকমতো পাকিয়ে ফেলতে পারলে তা দিয়ে পাগলা হাতির মতো বিশ্বপ্রকৃতিকেও বেঁধে ফেলা যায়। এই সংগঠনই মানবজাতির সবচেয়ে বিস্ময়কর ও প্রতিভাবান্বিত সৃষ্টি। মানুষ যেসব প্রাণঘাতী মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করেছে এ সেসবের চাইতেও শক্তিশালী। সংগঠন গড়ে তোলে ব্যক্তি, কিন্তু ব্যক্তির চেয়ে এ অনেক বড়। এ অনেক ব্যক্তির সমন্বয়োজ্জ্বল সংঘবদ্ধতার ভেতর ব্যক্তিকে অতিক্রম করে বিশাল রূপ পরিগ্রহ করে। এখানে একটা কথা বলে নিতে হয়। কিছু মানুষ কোনো উদ্দেশ্যে সমবেত হলেই তা সংগঠন কিন্তু হয় না। দল আর সংগঠন এক নয়। দলের মধ্যে সুবিন্যস্ত নেতৃত্ব-পরম্পরা গড়ে তোলা সম্ভব হলেই তা হয়ে ওঠে সংগঠন। তখন তা হয়ে ওঠে লক্ষ্যভেদী, অপ্রতিরোধ্য। তখনই তা কেবল ঐ দলের লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করতে পারে, অন্যথায় নয়।

এই স্তরপারম্পর্য থাকে বলেই খুব অল্পসংখ্যক মানুষ সুসংহতভাবে এগিয়ে অনেক বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করতে পারে। এমনি পারম্পর্যভিত্তিক সাংগঠনিক সংহতির কারণে আলেকজান্ডার মাত্র চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে অর্ধেক পৃথিবী জয় করতে পেরেছিলেন।

যেখানে এই স্তর-পারম্পর্য (হায়ারারকি) নেই তা কিছু বিশৃঙ্খল মানুষের অরাজক জটলা মাত্র, সংগঠন নয়।

অন্যসব শিল্পের মতো সংগঠনও একধরনের বিস্ময়কর ও দীপান্বিত শিল্প। কবিতার মতো সংগঠন শব্দের সামঞ্জস্য দিয়ে তৈরি হয় না, হয় মানুষের সামঞ্জস্য দিয়ে। প্রাণিজগৎ ও অন্যান্য মানবগোষ্ঠীর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সংগঠনের সমকক্ষ আর কিছু কল্পনীয় নয়।

৩

আমরা বাঙালিরা এই সংগঠনের বেলায় দুর্বল। পৃথিবীতে কত জাতিরই রাজ্য ছিল, সাম্রাজ্য ছিল, সাম্রাজ্যবাদ ছিল—আমাদের কোনোদিন রাজ্য, সাম্রাজ্য, সাম্রাজ্যবাদ কিছুই হল না? 'হল না'র চেয়ে বড় কথা এই জাতির দীর্ঘ দীর্ঘ

ইতিহাসে কোনো একটি পর্যায়ে সামান্য স্বাধীনতাটুকুও এর হয় নি। কী এর কারণ? একা একা যেসব কাজ করা যায়—যেমন কবিতা লেখা, শিল্প চর্চা, বিজ্ঞান সাধনা, মননশীলতা বা বৈদগ্ধ্য—এগুলোতে তো আমরা অনেক সমর্থ জাতিরই সমকক্ষ। কিন্তু দুজন অংশীদার এক সঙ্গে ব্যবসা করতে গেলে দুবছরের মধ্যে তা ভেঙে যায় কেন? কেন তারা দুজন দুজনকে খুন করার জন্যে রাতের অন্ধকারে ছুরি হাতে একা-একা ঘুরে বেড়ায়? কেন আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষমতার দ্বন্দ্বে এমন ক্ষতবিক্ষত এবং মুমূর্ষু। কেন এত সংকীর্ণতা ও অসহিষ্ণুতা? কেন রাষ্ট্রকে আমরা কিছুতেই স্থিতিশীল করতে পারছি না? এসব দেখে একটা কথাই থেকে থেকে আমার মনে হয় : সংগঠন তো সমষ্টি স্বার্থের প্রতিভূ, জীবনের 'বড় আয়োজন'; তাহলে কি আমাদের চরিত্রে ব্যক্তিস্বার্থের এমন কোনো সংকীর্ণ ও আত্মঘাতী প্রবণতা রয়েছে যা আমাদের সমষ্টিগত স্বার্থবুদ্ধির তুলনায় অনেক ধ্বংসাত্মক—যা ছোট স্বার্থকে তৃপ্ত করলেও বৃহত্তর স্বার্থের জায়গায় আমাদের ব্যর্থ করে দেয়? আমরা কি যতটা সমষ্টিগত তার চেয়ে বেশি আত্মগত? কিংবা যখন সমষ্টিগত হই তখনও তা হই আত্মগত কারণেই। আমরা কি কেবলই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা আর আত্মসর্বস্বতার ভেতরে আমাদের খণ্ডিত ও অশ্রুময় নিয়তিকে অন্বেষণ করি? 'বিচার আচার যাই হোক তালগাছটা আমার'—এই কি আমাদের শেষ কথা? ন্যায়নীতি নেই, সমষ্টিকল্যাণ নেই, পরহিত নেই, নিজের উচ্চতর স্বার্থও নেই; কেবল আমি আর আমার সংকীর্ণ স্বার্থ—এই সীমিত চেতনার মধ্যেই কি আমরা আমাদের উচ্চতর স্বার্থকে বিক্রি করে দিতে ভালোবাসি?

আগেই বলেছি সংগঠনের ব্যাপারে আমার কোনো পেশাদারী পড়াশোনা নেই; এক অপ্রস্তুত ও খাবি-খাওয়া অবস্থায়, হাতেনাতে কাজ করতে গিয়ে, সংগঠন গড়ে তোলার জায়গায় বাঙালিদের অসুবিধাগুলো কোথায়—এ ব্যাপারে আমি যতটুকু যা চোখে দেখেছি এই লেখায় তাই মোটা দাগে তুলে ধরার চেষ্টা করব। এ নেহাতই আমার শাদা চোখের অজ্ঞ উপলব্ধি। এ যদি পুরো ভুল বা হাস্যকরও হয় তাতেও আমার বলার কিছু নেই।

বছর-দশেক আগে, বাঙালির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় আস্থা হারিয়ে-ফেলা এক হতাশ ভদ্রলোক—ব্রিটিশ-আমলে ইংরেজ রাজকর্মচারীরা বাঙালির হীনতা, শঠতা, সুবিধাবাদী চরিত্র, এসব নিয়ে যেসব অসম্মানজনক মন্তব্য করেছিল তার একটা সংকলন আমাকে দিয়ে বলেছিলেন, 'আপনি তো এই জাতির ব্যাপারে আশাবাদী। নিন, এসব পড়ে দেখার পর বলুন, এ জাতির ওপর ওই ধরনের কোনো ভরসা রাখা যায় কি না!' ভদ্রলোকের গলার স্বরে ক্ষোভ নৈরাশ্য আর অভিমানের কণ্ঠ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। এই ক্ষোভ আর নৈরাশ্য আজ কেবল তাঁর একার ভেতরে নয়, এই জাতির প্রায় প্রতিটি মানুষের ভেতরে আমি দেখতে

পাই। এটা অকারণে নয়। এই দুঃখবোধের পেছনে বিশেষ করে দাঁড়িয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের জাতির জ্বলে-ওঠা স্বপ্ন ও মাত্রাতিরিক্ত আশাবাদ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়, আমাদের গোটা জাতি প্রথমবারের মতো বিপুল সমষ্টিগত বা জাতীয় শক্তিমত্তা নিয়ে জেগে উঠেছিল। প্রায় প্রতিটি মানুষ নিজ অস্তিত্বের চারপাশে যুগ-যুগ ধরে বেড়ে-ওঠা আত্মকেন্দ্রিকতার হীন দেয়ালকে বিপুল ঝাপটায় উড়িয়ে দিয়ে উজ্জীবিত হয়েছিল এক সুবিশাল আত্মোৎসর্গের স্বপ্নে। কিন্তু স্বাধীনতার পর এই অবস্থা খুবই বেদনাদায়কভাবে প্রতারিত হয়েছিল। অবারিত ঐহিক সম্ভাবনার সামনে সেই যুগ-যুগান্তরের আত্মস্বার্থপরায়ণ হীন মানুষটি আবার বেরিয়ে পড়েছিল আমাদের ভেতরকার অশুভ লালসার কালো গর্ত থেকে। তবে এবার আর কেবলমাত্র সেই ভিখারিটির বেশে নয়, সরাসরি লুণ্ঠনকারীর বেশে। না, ইয়োরোপীয় উপনিবেশবাদীদের মতো পরের দেশ লুণ্ঠন করে বিত্তবান হবার মতো শক্তি ছিল না তার। সে লুণ্ঠন করেছিল নিজের জাতি ও তার দারিদ্র্যকে। বিবেকহীন অলজ্জ দস্যুবৃত্তির পথে দেশের দরিদ্র জনগণের জন্যে আসা বৈদেশিক সাহায্য লুট করে সে গড়ে তুলেছিল তার বিত্তের পাহাড়। এ করতে গিয়ে জাতির পুরো মূল্যবোধকে সে ধ্বংস করে দিয়েছে, তবু সে থামেনি। জাতির জীবনে প্রথমবারের মতো আসা এই সুযোগকে সে হাতছাড়া করতে চায়নি। সে জানত যা লুটে নেবার তা এখনি লুটে নিতে হবে। এই সুযোগ বারবার তার জীবনে আসবে না। এই লুণ্ঠনকারীর চরিত্র আজ কেবল জাতির প্রধান দস্যুদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। প্রতিটি মানুষই আজ এরকম। এই লুণ্ঠনকারীর চরিত্র প্রতিটি দেশবাসীর ভেতর ছড়িয়ে গেছে। আজ দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ মাস্তান; যে যার জায়গায়। লুণ্ঠন আর এই জাতি আজ প্রায় সমার্থক।

আমি সেই ভদ্রলোককে বলেছিলাম : উনিশ শতকের ইংরেজ রাজকর্মচারীরা বাঙালির ভেতর কেবল সেই হীনচেতা ইতর ভিক্ষুকটিকেই দেখেছিল; রামমোহন, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথকে তো দেখেনি! এরাও তো বাঙালিরই আর-একটা রূপ! ঊনবিংশ শতকে বাঙালিদের মধ্যে ইয়োরোপীয় মাপের যে আত্মজাগৃতির জোয়ার এসেছিল, তা তাদের চোখে পড়েনি। তারা কেবল বঙ্কিমের মুচিরাম গুড়কে দেখেছে, তার পাশে একই সময়ের বিদ্যাসাগরকে দেখেনি। তারা আমাদের প্রভু ছিল বলে তাদের প্রজাদের মধ্যে-যে কোনো মহিমা বা কোনো বিষয়ে তাদের সমকক্ষতা বা শক্তিমত্তা থাকতে পারে এ তাদের হয়তো মনেও আসেনি। তবে এটা ঠিক যে তাদের দেখা বাঙালিই এদেশের যুগযুগের গড়পড়তা বাঙালি। তাদের মধ্যে যে হীনচেতনা ও সংকীর্ণচিত্ততা তারা শনাক্ত করেছিল সেগুলো খুব একটা মিথ্যা ছিল না।

৪

আজ আমাদের জাতির মধ্যে আমরা যে-অলজ্জ আত্মস্বার্থকেন্দ্রিকতা দেখি তা আজকের ব্যাপার নয়। ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা বাঙালির মধ্যে যখন এই হীনতাগুলো দেখেছিল এ তার চাইতেও অনেক পুরোনো। এই জাতির অতীতের দিকে তাকালে বাঙালির যে-চেহারা চোখে পড়ে তা খুব-একটা সম্মানজনক নয়। মাত্র একশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন তাতেও রয়েছে এরই প্রতিধ্বনি :

সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি।

কথাটার মানে একটাই : বাঙালি আজও মানবপদবাচ্য নয়। শক্তিতে নয় বলে মহত্ত্বে বা মর্যাদাতেও নয়। তবে কথাটার ইতিবাচক দিক এটুকুই যে, কথাটা উনি বলেছিলেন এই জাতির জন্যে অপরিসীম বেদনাবোধ ও ভালোবাসা থেকে। গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তিনি ভাবতে চেয়েছেন সেই অনাগত দিনের কথা যেদিন বাঙালি তার তথাকথিত বাঙালিত্বকে ডিঙিয়ে মানুষের মর্যাদাবান ভূমিকায় দেখা দেবে।

বাঙালির সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণ আত্মপরতা

১

আমার বহুবারই মনে হয়েছে প্রায় প্রতিটি বাঙালির মধ্যে এই-যে একটা দুরারোগ্য আত্মস্বার্থের প্রবণতা যা তার সমষ্টিগত অস্তিত্বের বা সমৃদ্ধির প্রায় বিরুদ্ধে, এ নিয়ে আমরা এগোব কী করে? কেননা এই সমষ্টিগত সমৃদ্ধি এমন একটা জিনিশ যাকে সুদৃঢ় ও সুবিকশিত করতে না-পারলে একটা জাতি তার উচ্চতর বিকাশকে কখনোই স্পর্শ করতে পারে না। এই আত্মপরতার সামনে যে-কোনো শুভবুদ্ধি ও সামষ্টিক কল্যাণকে পদদলিত করে যেতে আমাদের কোনো কুণ্ঠা নেই। এ থেকে আমি অবশ্যি বলতে চাচ্ছি না যে বাঙালির চরিত্র চিরদিন এরকমটা থাকবে। তা থাকবে না। পরিবর্তিত পরিপার্শ্বের সঙ্গে নিশ্চয়ই তার উন্নতি ঘটবে যার প্রমাণ এরই মধ্যে আমরা পেতেও শুরু করেছি। তবে একটা কথা আমাদের মানতেই হবে যে এ-পর্যন্ত আমাদের চেহারাটা মোটামুটি এর কাছাকাছিই। নিজের স্বার্থের জন্যে আমরা করতে পারি না এমন কিছুই নেই। এ ব্যাপারে আমরা প্রায় নিশ্চক্ষু ও নির্বিকার। আমি গাজীপুর এলাকার একজন শিক্ষকের কথা জানি যিনি প্রতিদিন ক্লাসে ঢুকে ছাত্রদের মুখের কাছে নাক নিয়ে এক এক করে সবার মুখের গন্ধ শুঁকে বেড়াতেন কারও মুখ থেকে বিড়িটিড়ির গন্ধ পাওয়া যায় কিনা সেই আশায়। কারও মুখে ঐ গন্ধ পেলে সুশিক্ষকের কর্তব্য হিসেবে তাকে দু-ঘা দিয়ে তার পকেট থেকে বিড়িগুলো তিনি কেড়ে নিতেন। দুপুরবেলায় দেখা যেত তিনি শিক্ষকরুমের বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসে নিজে সেই বিড়িগুলো পরম সুখে এক এক করে টেনে চলেছেন। মূল্যবোধের কী দুঃখজনক বিকৃতি! আজকাল ক্লাসে ছাত্রেরা বেশি প্রশ্ন করলে স্যাররা বিরক্ত হয়ে ওঠেন : 'ক্লাসে এত প্রশ্ন কিসের? বাড়িতে আসতে পারিস না?' মানে বাড়িতে আয়, প্রাইভেট পড়ে আমাকে টাকা দে। লুট এখন সব জায়গায়। আপনি সরকারের নির্মাণকাজ করে পাওনা চেক আনতে গেছেন, সেখানেও সেই ছোঁক-ছোঁক-করা কথা 'এত টাকা নিয়া যান, আমাগো কিছু দিয়া

যান না।' যেন টাকাটা তার, আপনি সেটা তার সামনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, কাজেই পুরোটা না দিলেও কিছু-একটা অংশ তাকে দিয়ে যেতে হবেই। ব্যাংক থেকে লোন নিতে যান, আপনাকে মোট লোনের পাঁচ থেকে দশ পারসেন্ট টাকা শুধু ঘুষ হিশেবেই দিয়ে আসতে হবে। এই শিল্পোদ্যোক্তা কেন ঋণখেলাপি হবেন না, তার উত্তর কি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর দিতে পারবেন? সি.বি.এ. আর ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তারা নিজেদের স্বার্থের জন্যে আমাদের গোটা শিল্পায়নকে পুরো ধ্বংস করে দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় দস্যুরা দেশের ব্যাংকগুলোর বিপুল টাকা লুট করে নিয়ে গেছে। কর-বিভাগের লোকেরা ঘুষ নিয়ে গোটা দেশকে শুল্ক-আয় থেকে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত করে চলেছে। আমদানি-রপ্তানিকারকদের কাছ থেকে নানান ওজর তুলে কাস্টমসের লোকেরা এমন নির্দয়ভাবে ঘুষ নিচ্ছে যে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের আয়ের প্রায় অর্ধেকটাই তারা পকেটে পুরে ফেলছে। এই দুর্নীতিপরায়ণতা (যার মূল কারণ আত্মপরতা) আজ এমন উদ্দাম আর বেপরোয়া যে দেশের প্রতিটি অঙ্গনের প্রতিটি জায়গা এই বল্গাহীন অনৈতিকতার সংক্রামে পুরোপুরি বিপন্ন হয়ে গেছে। কথায় আছে : কাক কাকের মাংস খায় না। কিন্তু আমাদের এই দুর্নীতির সর্বগ্রাসিতার ভেতর সরকারি কর্মচারীরা তো অন্যেদের কাছ থেকে ঘুষ নিচ্ছেনই, এমনকি সহকর্মীদের কাছ থেকেও নির্বিকারে ঘুষ চাচ্ছেন এবং তা নিয়েও ছাড়ছেন। যিনি যাকে যেখানে কায়দামতো পাচ্ছেন তার কাছ থেকে তা আদায় করছেন। রাষ্ট্রের অভিভাবকদের মধ্যেও এই লিপ্সা আর আত্মপরতা একইরকম। পরীক্ষার নকলে, চাঁদাবাজির সহিংসতায়, সন্ত্রাসের তাণ্ডবে, শিক্ষাঙ্গনে, আদালতে, বাণিজ্যকেন্দ্রে—সব জায়গায় নির্বিবেক ব্যক্তিগত স্বার্থলিপ্সা সমষ্টির কল্যাণ ও সংঘবদ্ধতাকে বিপন্ন করতে উদ্যত। সারা জাতির প্রতিটি জায়গায় আজ এসব যা হচ্ছে তা তো লুণ্ঠন—যার অন্য নাম আত্মঘাত—যূথবদ্ধ মানুষের কল্যাণের ওপর ব্যক্তিস্বার্থের আক্রমণ। ন্যায় ও সংঘশক্তির সার্বভৌমত্বের ওপর আত্মপরায়ণ মানুষের সর্বাত্মক সন্ত্রাস। সংগঠন তো মানুষের সমষ্টিগত স্বার্থ। সেই স্বার্থের ওপর আত্মস্বার্থের আক্রমণ এমন নির্বিবেকভাবে চলতে থাকলে রাষ্ট্রসংগঠন কী করে সুস্থির বা শক্তিশালী হবে? দেশের সাধারণ সংগঠনগুলোরই বা ভবিষ্যৎ কী?

২

আমার মনে অনেকবার এই প্রশ্ন জেগেছে : কেন আমরা এতখানি আত্মস্বার্থপরায়ণ? কেন নিজের বাইরে আর কিছুই আমরা দেখতে পারি না, বুঝতে চাই না? কেন আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের জন্যে (যা শেষ বিচারে আত্মস্বার্থই) দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণকে ধ্বংস করে ফেলতে

দ্বিধা করে না? এর মধ্যে অনেকেই বয়োবৃদ্ধ, পলিতকেশ। এরপরেও কেন এই সামান্য স্বার্থটুকু ত্যাগ করতে পারে না? কেন কেবলই 'আমার হবে তো', 'আমি পাব তো', এই অশ্লীল অকথ্য চিৎকারের নিচে আর সবকিছুকে আমরা নিমজ্জিত করে ফেলি? 'তালগাছ' যারই হোক, ওটাকে নিজের দখলে না-পাওয়া পর্যন্ত কেন আমরা এমন ক্লান্তিহীন, ক্ষমাহীন?

আমার ধারণা বাঙালি-যে আজ পর্যন্ত সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী হতে পারেনি তার চরিত্রের এই আত্মপরায়ণপ্রবণতাই এর একটা বড় কারণ। তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থলিপ্সা আজও তার সংঘবদ্ধতার স্বপ্নের চেয়ে শক্তিশালী। তার এই আত্মসর্বস্ব স্বার্থলিপ্সা যে কী অসুস্থরকমের যুক্তিহীন, একটা গল্প বলে তা বোঝাতে চেষ্টা করি [গল্পটা আমি আমার একটা বইয়ে লিখেছি। তারই কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করলাম] :

> "১৯৮৬-৮৭ সালের দিকের কথা। কেন্দ্রের [বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের] ছেলেদের নিয়ে সাইকেল ভ্রমণে বেরিয়েছি। দিন-কয়েকের যাত্রা। তৃতীয় দিনে রাত প্রায় দশটার দিকে আমরা একটা প্রাইমারি স্কুলের বারান্দায় রাতের আশ্রয় নিলাম। বাংলাদেশের অজ পাড়াগাঁর স্কুল। আমাদের ছেলেরা স্কুলের বারান্দায় বাক্স-প্যাটরা রেখে মাঠের পাশে চুলো জ্বালিয়ে রান্নার আয়োজনে লেগে গেল। চুলোর আগুনে কালো রাতটা লাল হয়ে উঠল। আচমকা এই প্রত্যন্ত এলাকায় এতগুলো শহুরে লোকজন দেখে গাঁয়ের লোকেরা কৌতূহলী হয়ে আমাদের চারপাশে ভিড় জমাল। তারপর যথারীতি নানান জেরা : কোথা থেকে আসছি, কেন সাইকেলে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সাইকেলে ঘুরে কী হয়—এইসব।
>
> গেঁয়ো মানুষের ভিড়ে একজন লোকের সপ্রতিভ কথাবার্তায় সচকিত হয়ে গেলাম। লোকটার চেহারা দারিদ্র্যক্লিষ্ট। পরনে ছেঁড়া শার্ট আর লুঙ্গি, চোখের নিচে কালি। দৃষ্টি উপবাস-আতুর। কিন্তু প্রতিটি কথায় যেন তলোয়ারের ঝিলিক। এমন ক্ষুরধার কথাবার্তা তার যে অবাক না হয়ে পারছিলাম না। তার কথার ধারালো সরস মন্তব্যে আর ব্যঙ্গবিদ্রূপে দমকে দমকে হেসে উঠতে লাগল আমাদের ছেলেরা। কথায় বোঝা যায়, লোকটার লেখাপড়া সামান্য—সপ্তম-অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হবে খুব জোর। আমাদের নিয়ে এভাবে ইচ্ছামতো খেলতে পারছে দেখে লোকটাও যেন খানিকটা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল। কথার ধার তার ক্রমেই বেড়ে চলল। একপর্যায়ে সপ্রশংসভাবে বলেই ফেললাম, 'আপনার তো ভাই খুব বুদ্ধি!'
>
> কিন্তু কি প্রশ্ন আর কী উত্তর! লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'প্রেসিডেন্ট হইনি বলে বুদ্ধিও প্রেসিডেন্টের চেয়ে কম হবে না কি?* আবার সবার দম-ফাটা হাসি।
>
> হকচকিয়ে গেলাম। কী বলে লোকটা! কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না যে ছেঁড়া

---

* এ সময়টা ছিল এরশাদের শাসনামল।

জামাপরা এই তুচ্ছ লোকটার বুদ্ধির প্রসঙ্গ আলোচনায় দেশের প্রেসিডেন্টের কথা আসে কী করে! একটু প্রকৃতিস্থ হতেই টের পেলাম কত সহজে সে ছোট্ট একটা কথায় আমাদের জাতির দুটো বড় বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য : এদেশের কোনো মানুষ—এমনকি তুচ্ছতম মানুষটা পর্যন্ত কখনো কোনোকালে নিজেকে কারো চেয়ে—হোক না সে প্রেসিডেন্ট—কম ভাবতে কতটা নারাজ।

দ্বিতীয়ত : কী করে আশ্চর্যভাবে সে টের পেয়ে গেছে দেশের প্রেসিডেন্টগুলো অন্তত তার চেয়ে নির্বোধ।"

গল্পটার যে-অংশটুকু আমি এখানে শোনাতে চাই তার এখানেই শেষ। লোকটার কথা শেষ হলে আমি বিমূঢ় হয়ে পড়লাম লোকটার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নচারিতার পরিমাণ দেখে। অবাক লাগল এ ভেবে যে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অজ পাড়াগাঁর একটা লোক, জীবন যাকে শিক্ষার বা উন্নতির সুযোগ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত করেছে, অপুষ্টিতে অনাহারে চোখে কালশিয়া পরা যে-লোকটার গাল গর্তের ভেতর তোবড়ানো—তার পক্ষে এ-ধরনের চিন্তা খুবই অবাস্তব নয় কি? এটা হতে পারে যে দেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হবার মতো প্রতিভাগত যোগ্যতাও তার রয়েছে (শুধু তার কেন, আমাদের দেশের অন্তত পঞ্চাশ লাখ লোকের এই যোগ্যতা রয়েছে), এবং বাস্তব অবস্থা ভিন্ন হলে তা হওয়াও হয়তো অসম্ভব ছিল না; তার চেয়ে বড় কথা প্রখর বুদ্ধি দিয়ে সে হয়তো সহজাতভাবেই টের পেয়েছে যে দেশের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিরা তার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান নয়, কিন্তু তার অবস্থানের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির অবস্থানের বাস্তব দূরত্বটা তাকে বুঝতে হবে না কি? নিজেকে রাষ্ট্রপতির সমকক্ষ ভেবে নেওয়াটা আত্মবিশ্বাসের একটু বেশিরকম বাড়াবাড়ি নয় কি?

শুধু এই লোকটি নয়, আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটা মানুষের মনের গহন জায়গাটা অনেকটা এরকম। আত্মপ্রাপ্তির লাগামহীন লিপ্সায় তারা কামান্ধ ও আপোষহীন। এই জগতে কোনো মানুষের চেয়ে কোনোভাবে নিজেকে কম মনে করে এমন বাঙালি এই পৃথিবীতে নেই। পৃথিবীর প্রতিটি বিষয় পরিপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠভাবে জানে না এমন বাঙালি এই পৃথিবীতে নেই। আপনি কোনো কারখানার একজন শ্রমিককে জিগ্যেস করুন তার জীবনের দুঃখ কী, একটা উত্তরই তার কাছ থেকে আপনি পাবেন : সেই এই কারখানার মালিক নয় কেন? মালিকের চেয়ে সে কম কিসে? কোনখানে অযোগ্য? একজন রাজনৈতিক কর্মীকে আপনি জিগ্যেস করে দেখবেন, তার জীবনের দুঃখ কী, একটা উত্তরই আপনি তার কাছ থেকে পাবেন : সে দলের সভাপতি নয় কেন? ইয়োরোপে তো এমনটা নয়। জাপানে, আমেরিকায়, চীনেও তো না। সবখানেই তো মানুষেরা অন্য সবকিছুর সঙ্গে তাদের তুলনামূলক অবস্থানটা বুঝে নিতে পারে; সেভাবেই নিজেদের চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণকে সামঞ্জস্যময় করে নেয়। আমরা সেটা পারি না কেন? কেন আমাদের চিন্তায় এমন

যুক্তিবর্জিত নৈরাজ্য? কেন আমরা আমাদের একমাত্র ও নিষ্কৃতিহীন ব্যক্তিগত প্রাপ্তির সামনে সারা পৃথিবীর সমস্ত বাস্তবতাকে পুরোপুরি ভাসিয়ে দিই? কেন 'আমি' ছাড়া আর সবকিছু আমাদের কাছে মিথ্যা হয়ে যায়?

৩

আমাদের এই আত্মপরতার (যা আমাদের জাতির সাংগঠনিক বিকাশকে দুর্বল করে রেখেছে) দুটো কারণ থাকতে পারে : এক. সাংস্কৃতিক (ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক); দুই. শারীরিক। প্রথমে আমি এর সাংস্কৃতিক কারণগুলো নিয়ে একে একে আলোচনা করে নিতে চাই।

এই-যে আমাদের এমন একা-একা বা ছাড়া-ছাড়া ভাব, সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের আত্মকেন্দ্রিক কুঠুরির সংকীর্ণ ও সীমিত জগৎকে নিরঙ্কুশ ভাবার প্রবণতা—তার একটা বড় কারণ, আমার ধারণা, ইতিহাসের প্রায় কোনো পর্বেই বাঙালি জাতির নিজেদের কোনো স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল না। এ-ধরনের অতীত-যে একটা জাতির জন্যে কতবড় দুর্ভাগ্যের তা বলে শেষ করা সম্ভব নয়। নিজস্ব রাষ্ট্র যে-জাতির থাকে না, সে-জাতি 'বড় আয়োজনে' কী করে বাঁচতে হয়, চারপাশের মানুষদের অবস্থানের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে ও সামঞ্জস্য বিধান করে কী করে সবাইকে নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হয় তা বুঝে উঠতে পারে না।

আজ আমাদের দেশটাকে নিয়ে আমরা-যে এমন বিশৃঙ্খল, অপ্রস্তুত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থার মধ্যে পড়েছি তার কারণ অতীতে নিজেদের রাষ্ট্রের ভেতর বসবাসের অভিজ্ঞতা না থাকা। এই কারণে একাকিত্বের অনুভূতি আমাদের এত তীব্র। রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধ ও তার ব্যবস্থাপনাঘটিত বিষয়ে আমরা পুরোপুরি অজ্ঞ। সেখানে আমার ব্যক্তিগত অবস্থানকে প্রকৃতভাবে চিহ্নিত করতেও আমরা অক্ষম। এর ফলে, আমাদের শত আকুতি সত্ত্বেও একটি সুসংহত রাষ্ট্রে পরিণত হতে আমাদের এমন দীর্ঘ সময় লেগে যাচ্ছে।

আমরা মুখে মুখে বলছি ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে রাষ্ট্র বড়। কিন্তু কাজের সময় দেখতে পাচ্ছি রাষ্ট্রের চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে ব্যক্তি বড়। অতীতে কখনো রাষ্ট্র নামের বৃহত্তম জাতীয় সংগঠনটি গড়ে তুলতে না-পারায় বাঙালিরা কোনোদিনই ঠিকমতো ঐহিক বা মানবিক শৃঙ্খলার মধ্যে আসেনি। শক্তপোক্ত জাতীয় কাঠামোর মধ্যেও সে বাস করেনি। তাই কোথায় যেন একটা গা-ছাড়া ভাব থেকে গেছে। ১৯৪৭ সালে বঙ্গদেশ-যে এত সহজে বিভক্ত হয়ে যেতে পেরেছিল এবং আজ অর্ধশতাব্দী পার হবার পরেও-যে জার্মানি, ভিয়েতনাম বা কোরিয়ার মতো কোনো পুনরেকত্রীকরণের তীব্র আকুতি বেগমান হয়ে ওঠেনি তার কারণও

অনেকটা এ-ই—অখণ্ড অঞ্চলভিত্তিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় দীর্ঘমেয়াদে বসবাসের ঐতিহ্য বা ইতিহাস না-থাকা।

ভৌগোলিক অবিচ্ছিন্নতা ও অভিন্ন ভাষার কারণে এই জাতি আবহমানকালবাহী একটি অখণ্ড সংস্কৃতি গড়ে তুললেও রাজনৈতিকভাবে এদেশ ছিল প্রাচীন আমল থেকেই ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় এলাকায় বিভক্ত। সম্রাট আকবর এই এলাকাটাকে সুবা বাংলা নামের আওতায় নিয়ে এলেও প্রাচীনকাল থেকেই এই এলাকা রাঢ়, পুণ্ড্র, সমতট, বঙ্গ, হরিকেল, গৌড়—এমনি নানান ছোট-বড় রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে পরিচিত ছিল। পরের দিকে বারো ভূঁইয়ারাও ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় বিভক্ত হয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন সময় কাটিয়েছে। ব্রিটিশ আমলে বাঙালি-অধ্যুষিত প্রায় পুরোটা অঞ্চল বঙ্গদেশ নামের আওতায় নতুন করে সুসংহত হলেও এদেশের মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সাংস্কৃতিকভাবে যতটা অখণ্ডতা অনুভব করেছে, রাজনৈতিকভাবে ততটা করেনি। ঐ চেতনায় সে সবসময়ই কমবেশি বিচ্ছিন্ন। যে-কোনো লোককে যদি আজও আপনি জিগ্যেস করেন : 'দেশ কোথায়', সে সবসময়েই উত্তর দেবে অমুক জেলায়। এর অর্থ একটাই। বাঙালির 'দেশ' চেতনা আজ অব্দি জেলাচেতনার বাইরে খুব একটা যায়নি। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তীব্র আঞ্চলিকতার প্রবণতা ও সাধারণ মানুষের বৈষয়িক চিন্তাচেতনার মধ্যে তীব্র জেলাকেন্দ্রিকতা এর একটা বড় কারণ। যখন যে-জেলার নেতা রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান হন, তখন প্রায় পুরোপুরি সে-জেলাটাই বাংলাদেশের ক্ষমতায় এসে পড়ে। পাকিস্তানি আমলে মোনায়েম খানের জেলা ময়মনসিংহ, শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনার আমলে গোপালগঞ্জ, জিয়াউর রহমানের আমলে বগুড়া, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আমলে রংপুর এবং খালেদা জিয়ার আমলে দিনাজপুর বাংলাদেশের ক্ষমতায় এসেছিল এবং পঞ্চাশের দশকে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে এবং ষাটের দশকে ফজলুল কাদের চৌধুরী পাকিস্তানের স্পিকার হলে বগুড়া এবং চট্টগ্রাম ক্ষমতায় আসি-আসি করেছিল। ব্যাপারটা বারো ভূঁইয়া ও তারও আগের সব আমলের খণ্ডিত আঞ্চলিক চেতনারই ধারাবাহিকতা বলে মনে হয়। উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকে বাঙালি হিন্দুর দেশচেতনা (বাঙালি জাতীয়তাবোধ), ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পাশাপাশি এগিয়ে গিয়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তুঙ্গ স্পর্শ করে বিশ শতকের চতুর্থ দশকের শেষদিকে আবার ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে একাকার হয়ে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়। অখণ্ড বঙ্গকে কেন্দ্র করে বাঙালি মুসলমানের দেশচেতনাও কখনোই খুব একটা দানা বাঁধেনি।

সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে তোলার এবং তার ভেতর স্থায়ীভাবে বাস করার সুযোগ হয়নি বলে রাষ্ট্রের অর্থাৎ জাতির বৃহত্তম সংগঠনটির সঙ্গে আমরা কমবেশি অপরিচিত থেকে গেছি। কাজেই নিজেরই উচ্চতর বিকাশের স্বার্থে নিজের ছোট স্বার্থকে ছাড় দিয়ে যে কীভাবে বৃহত্তর স্বার্থ সিদ্ধি করতে হয় কিংবা নিজের বড়

স্বার্থটিকে অর্জন করতে হয় তা আমাদের জানা হয়ে ওঠা হয়নি। এই জন্যে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে রাস্তার সামান্য মানুষ—কারো আচরণেই রাজোচিত আচরণের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের সর্বোচ্চ ব্যক্তিদের আচরণ এখনো পর্যন্ত গ্রামের মোড়লদের ছাড়িয়ে খুব বেশিদূর যেতে পারেনি। রাষ্ট্র-সংগঠন সুসংহত না-হওয়ায় জাতির অন্যান্য ক্ষেত্রের সংগঠনগুলোও ঠিকমতো গড়ে ওঠেনি। নানারকম পরোক্ষ প্রমাণ থেকে টের পাওয়া যায় দুয়েক-শ বছর আগে পর্যন্ত আমাদের গ্রাম-সংগঠনগুলোও ছিল খুবই শিথিল ও অবিন্যস্ত। জনাব আকবর আলী খান কিছুদিন আগে দেখিয়েছেন : জল-স্বল্পতার কারণে উত্তর-ভারতের পল্লী-এলাকায় জল-ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে যে গ্রাম-সংগঠন (ব্যবস্থাপনা) গড়ে উঠেছিল, বাংলাদেশে সে-সমস্যা না-থাকায় সে-ধরনের কোনো মজবুত সংগঠনও গড়ে ওঠেনি। ফলে বাঙালিরা প্রায় চিরকাল রয়ে গেছে সবরকম সংগঠনের বাইরে। মধ্যযুগের শুরু থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ওয়াহাবী আন্দোলনের পর থেকে সাধারণ মুসলমানেরা ধর্মীয় সংগঠনের আওতাভুক্ত হলেও মোটামুটিভাবে গয়রহ বাঙালি চিরকালই বাস করেছে লক্ষ্যযোগ্য সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। এমন আধা-বিচ্ছিন্নভাবে বাস করা মানুষদের পক্ষে কিছুটা 'একা একা' বা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

সংগঠনের বাইরে বাস করা মানুষদের আরও একটা সমস্যা থেকে যায়। এই সমস্যা অনেকটা বঙ্কিমের *'কপালকুণ্ডলা'*- উপন্যাসের কপালকুণ্ডলার মতো। সংগঠনের ভেতর কখনো তাদের বাস করতে হয়নি বলে ওই সংগঠন-কাঠামোর কোন্ তলে কেন কোথায় তার অবস্থান তা সে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারে না। নিজের বাইরেও তার ভাবনা বেশিদূর পর্যন্ত যায় না। ফলে মনের ভেতরে সে হয়ে ওঠে একা ও একমাত্র। নিজের অস্তিত্ব নিয়ে বিচ্ছিন্ন আর নিঃসঙ্গ হয়ে থাকা ছাড়া নিজের আর কোনো পরিচয় সে অনুভব করে না।

আমাদের মধ্যেও এ-ধরনের একটা মানসিকতা বেশ জোরালো বলেই আমার মনে হয়।

৪

আমাদের যুগ-যুগের পরাধীনতাও আমাদের আত্মকেন্দ্রিকতার অন্যতম সাংস্কৃতিক কারণ। ইতিহাসের কোনো পর্যায়ে কখনোই আমরা প্রায় স্বাধীন ছিলাম না। সবসময়েই বিদেশিরা আমাদের দেশ আক্রমণ ও অধিকার করে রেখেছে, লুটতরাজ করেছে, ভোগদখল করেছে। আমরা এর বিরুদ্ধে কখনোই বড় কোনো প্রতিরোধ গড় তুলতে পারিনি। এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম বড় আকারের প্রতিরোধ এই মাত্র

সেদিন, প্রথমে ব্রিটিশ-বিরোধিতায় ও পরে ১৯৭১ সালে, স্বাধীনতাযুদ্ধে। এর আগের যা-কিছু ঘটনা তা নেহাতই ছোটখাটো, বিক্ষিপ্ত ও স্থানীয় পর্যায়ের। বহিরাগতদের আক্রমণের মুখে আমরা কেবলই পালিয়েছি। মানুষ যুদ্ধে যায় একসঙ্গে, কিন্তু পালায় একা-একা। পালাতে পালাতে আমরা একা হয়ে গেছি। একা আর বিচ্ছিন্ন। নিজের নিজস্ব ছোট্ট অস্তিত্বটি টিকিয়ে রাখা ছাড়া আর-কোনোকিছুই আমাদের কাছে তত গুরুত্ব পায় না। আমাদের সাধারণ মানুষের একাকিত্বের একটা বড় কারণ হয়তো এইটিই।

আমাদের সম্পন্ন মানুষেরাও আবার এই বিচ্ছিন্নতার অন্য ধরনের সন্তান। যুগযুগ ধরে এই পালানোর ভেতর আমাদের শ্রেষ্ঠ মানুষেরা ওই দখলদার বিদেশিদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলে নিজেদের বাঁচিয়েছিল এক অমর্যাদাকর উপায়ে—ওই বিদেশিদের এদেশীয় দালালে পরিণত হয়ে। আমাদের ওপর বিদেশিদের শাসন চিরস্থায়ী করার ব্যাপারে তারা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে, জনগণের সবরকম সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে নির্মূল করার জন্যে সবচেয়ে সচেষ্ট থেকেছে এবং এই সহযোগিতার পুরস্কারস্বরূপ বিদেশি প্রভুদের কাছ থেকে মূল্যবান পারিতোষিক হাতিয়েছে। এরাই তো ছিল ওইসব যুগে এদেশের রাজাকার। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র ভবানন্দ মজুমদার তো এরাই। এই অন্নহীন বস্ত্রহীন দেশে যাদের বাড়িতে গোলাভরা ধান আর গোয়ালভরা গুরু থাকত তারা তো এরাই। জাতীয় দালালদের এই প্রজাতি এখনো লুপ্ত হয়নি। এখনো আমাদের দেশের সর্বোচ্চ মানুষদের অধিকাংশের মধ্যে এই ধরনের দালালি মনমানসিকতা দেখা যায়।

৫

আমাদের স্বভাবগত একাকিত্বের অন্য একটি কারণ হতে পারে আমাদের দেশের মৃদুভাবাপন্ন জলবায়ু এবং খাদ্যের সুলভতা। বৈরী ও চরমভাবাপন্ন প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে যে-মানুষদের টিকে থাকতে হয় সংঘবদ্ধতার চর্চা তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই জন্ম নেয়। সংঘবদ্ধতা না-থাকলে তারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইয়োরোপের প্রচণ্ড শীতের ভেতর যাদের খাদ্যান্বেষণে বেরোতে হত তাদের সংঘবদ্ধ না হয়ে উপায় কী? কিন্তু বাংলাদেশের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, উর্বর জমি আর খাদ্য ও পানীয়ের সহজলভ্যতার মধ্যে মানুষের সংঘবদ্ধতা অতটা অনিবার্য হয়নি। মানুষ এখানে বাড়ির পাশের জঙ্গলের কাঁচা কলা খেয়েও দু-পাঁচ দিন অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পেরেছে। এই পরিস্থিত সংঘবদ্ধতার প্রয়োজনকে কিছুটা কমিয়ে দেয় বলেই মনে হয়। সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন না-থাকাও তাই আমাদের চরিত্রের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার একটা কারণ হতে পারে।

আরও যেসব কারণ বাঙালিদের পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ও একা করেছে তার আর-একটি কারণ, আমার ধারণা, এই জাতির যুগ-যুগের অসহনীয় অমানুষিক দারিদ্র্য। সম্পদ-বৈভবের মধ্যে মানুষের একধরনের একাকিত্ব থাকে, এ-একাকিত্ব সে-একাকিত্ব নয়। এ একাকিত্ব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার নির্মম সংগ্রামে লিপ্ত মানুষের নৃশংস একাকিত্ব। তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি' গল্পে তারিণী মাঝি যে-কারণে বন্যার ক্ষুধার্ত জলস্রোতের ভেতর জাপটে-ধরা প্রিয়তমা স্ত্রীকে গলা টিপে দূরে সরিয়ে দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছিল বা জ্যাক লন্ডনের গল্পের স্বর্ণসন্ধানী ভাগ্যান্বেষীরা যেভাবে গভীর জঙ্গলের মধ্যে কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্যে আমরণ নিষ্ঠুর ও একক সংগ্রাম চালিয়ে গেছে--এ একাকিত্ব তেমনি এক অমানুষিক, নিষ্ঠুর ও নিষ্পিষ্ট একাকিত্ব।

অসম্ভব দারিদ্র্যের মধ্যে বাস-করা মানুষের কতকগুলো পরিচিত আচরণ আছে। সে কোনোকিছুকে ছেড়ে দিতে বা কোনোকিছু থেকে পিছিয়ে পড়তে রাজি হয় না। ওই বিলাসিতা তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রয়োজনে রোমান গ্ল্যাডিয়েটারদের মতো বা তারিণী মাঝির মতো সবচেয়ে প্রিয়মানুষটিকে খুন করে হলেও তাকে বেঁচে থাকতে হয়। বড়লোকের বাড়িতে জাকাতের কাপড় নেবার জন্যে যে ক্ষুধার্ত, অনাহারী, দরিদ্র আর কঙ্কালসার মানুষদের ভিড় হয় সেই উচ্ছৃঙ্খল হিংস্র সংক্ষুব্ধ জনতাকে লাইনে দাঁড় করানো যে কতটা অসম্ভব তা প্রত্যক্ষদর্শীমাত্রেই জানেন। মেরে, চাবকে, গুলি করেও কেউ সেটা করতে পারে না। সবাই সেখানে সামনে দাঁড়ানোর জন্যে মরিয়া, কেউ পেছনে দাঁড়াতে চায় না।

অতীতে অমনি বহুবার পেছনে দাঁড়িয়ে তারা ঠকেছে, বঞ্চিত হয়েছে। দেখছে এতে ঠকতে হয়। সামনের মানুষেরা আগবাড়িয়ে সব নিয়ে চলে যায়। তাই বারবার একই ভুল করার শৌখিনতা তারা করতে চায় না। একই দৃশ্য দেখা যায় রাস্তায়, গাড়ি চালানোর সময়। গাড়ির মালিকেরা যখন গাড়ি চালায়, তখন তাদের মধ্যে কমবেশি একটা সহজভাব বা মানসিক সুস্থিরতা থাকে, তারা গাড়ি চালায় ঢিলেঢালা আয়েশি মেজাজে, অন্যদের সুযোগসুবিধা দেখে-বুঝে। কিন্তু সাধারণ চালকেরা যখন গাড়ি চালায় (যারা অধিকাংশই এসেছে দরিদ্র পারিবারিক পটভূমি থেকে, যাদের শিক্ষার সুযোগ বা অন্য কোনো প্রাপ্তিই জীবনে জোটেনি) তাদের অনেকেই চালায় কিছুটা অসুস্থের মতো—সবাইকে পিছে ফেলে, দুগাড়ির মাঝখানকার বিপজ্জনক সংকীর্ণ গলির ভেতর আতঙ্ককর মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে, অসহ্য হর্নের শব্দে সবাইকে উত্ত্যক্ত আর অসুস্থ করে। দেখলেই মনে হতে চায় মানুষটির হয়তো মানসিক সমস্যা আছে। হয়তো সত্যি সত্যিই আছে। যে অমানুষিক দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন থেকে সে এসেছে সেখানে একজন মানুষের মানসিক ভারসাম্য থাকার কথা নয়। পরাজিত হতে হতে সে পুরোপুরি নিঃস্ব, নতুন করে পরাজিত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাকে যেতে হবে সবার সামনে—অন্যায়ভাবে

ওভারটেক করে হোক, আইন অমান্য করে হোক, রাস্তার মানুষজনকে ওলটপালট করে হোক, ন্যায়নীতিকে পদদলিত করে হোক বা অন্য যেভাবেই হোক। এই শহরের সকল গাড়ির সামনে এগিয়ে গিয়ে অস্তিত্বের বিজয়-পতাকা ওড়াতে হবে তাকে। তার যুগ-যুগের বঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে হবে। তার হাতে আজ নতুন মডেলের পাঁচ হাজার সিসির নিশান পেট্রোল। কেন সে থামবে?

দারিদ্র্যের সংস্কৃতি মানুষকে তার মানবিকতাবর্জিত নিঃসঙ্গ একক কুঠুরির মধ্যে অসুস্থ, অন্ধ এবং অসহিষ্ণু করে রাখে। নিজের অস্তিত্বের বাইরে সে আর কোনো কিছুই চিনতে চায় না। দু'পাঁচ টাকার জন্য বস্তিতে রাস্তায় গরিব-দুঃখী মানুষদের যেমন হিংস্র জন্তুর বেপরোয়াভাবে পরিচিত মানুষদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ বা মারামারিতে লিপ্ত হতে দেখা যায় তা থেকেও সর্বস্বান্ত বা নিঃস্ব মানুষের নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্বের করুণ চেহারাটি চোখে পড়ে। মাত্র তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে এই দেশ আগাগোড়া ছিল দরিদ্র। আজকের এদেশের লুণ্ঠনকারী, রাষ্ট্রীয় দস্যু, জাতির নিয়তি-নির্মাতা থেকে শুরু করে সারাদেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ এই মানবেতর দারিদ্র্য থেকে উঠে আসা। এই বঞ্চিত, শোষিত, নিঃস্ব, হিংস্র মানুষেরা কেনই বা হবে না নৃশংসভাবে আত্মস্বার্থপ্রণোদিত; আর কেনই বা তাদের হাতে আমাদের দেশের সংগঠন, জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্র বিপন্ন হবে না!

বাঙালির সাংগঠনিক দুর্বলতার আরও কারণ : ব্যক্তিগত অসহায়তা, অক্ষমতা, হীনমন্যতা ও আত্মঘাত

১

সন্দেহ নেই আমাদের একাকিত্ব এবং আত্মসর্বস্বতা আমাদের জাতির সংগঠন গড়ে না-উঠতে পারার অন্যতম কারণ। কিন্তু এর আরও অনেক কারণ রয়েছে। তার একটি, যদ্দুর বুঝি : আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের ব্যক্তিগত পর্যায়ের অক্ষমতা ও অসহায়তা। বিষয়টিকে একটু বড়সড় করে তুলে ধরার চেষ্টা করি।

এই জাতির অতীত ইতিহাস বড় ধরনের সাফল্যের ইতিহাস নয়। আমাদের এমন কোনো সাফল্য নেই যার জন্যে বৈশ্বিক মাপে আমরা অভিনন্দিত হতে পারি এবং পরস্পরকে একই গৌরবের অধিকারী ভেবে নিজেদের ভেতর একাত্মতা ও আত্মীয়তা অনুভব করতে পারি। বিশেষ করে আমাদের কর্মজগতের বা ঐহিক জগতের সাফল্য (যে-জায়গায় উঁচু মাপের সাফল্য ছাড়া একটি জাতির মানসিক সহমর্মিতা বা দেশপ্রেম মজবুত হতে পারে না) একেবারেই সামান্য। ব্যবসায়, বাণিজ্যে, রাজনীতিতে, সামাজিক সংগঠনে, উৎপাদনে, ব্যবস্থাপনায় আমাদের অবস্থান খুবই নিচুতে। বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশের একটি। এছাড়াও আমাদের নিঃস্বতা আরো অনেক জায়গায়। তবু আমি এ-কথা বলব না যে বাঙালির জীবনে উজ্জ্বল সাফল্য একেবারেই নেই। আগেই বলেছি সংঘবদ্ধতার শক্তি দিয়ে একটা জাতি যে-সাফল্য পেতে পারে, আমরা তা না-পারলেও একা মানুষ-যে কতটা সফল হতে পারে বা বিপুল ও অমিত শক্তি ধারণ করতে পারে তার উদাহরণ আমাদের জাতির ভেতর আমরা বহুবার দেখেছি। ব্যক্তিপ্রতিভার ক্ষেত্রে আমাদের জাতি অতিপ্রজ। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্য হয়ে উনিশ ও বিশ শতক জুড়ে বাঙালির মধ্যে যেসব অসামান্য প্রতিভার ঢল নেমেছিল তা যে-কোনো জাতির জন্যেই গৌরবের।

বছর-বিশেক আগে আমার এক বন্ধু আমাকে বাঙালির সাংগঠনিক অক্ষমতার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন : একা বাঙালি দেবতা, কিন্তু একসঙ্গে হলে তারা

অমানুষ। কথাটা আপাতভাবে শুনতে সুন্দর, কিন্তু আমি তার কথার দ্বিতীয় বক্তব্যের সঙ্গে একমত হলেও প্রথম অংশের সঙ্গে একমত হইনি। আমি মনে করি না—একা বাঙালি মানেই দেবতা। বাঙালির মধ্যে আমি এতবেশি অক্ষম ও ক্ষুদ্রচেতা মানুষ এ-পর্যন্ত দেখেছি যে ওই কথার সাথে একমত হওয়া আমার পক্ষে হয়তো কোনোদিনই সম্ভব হবে না। তবু কথাটার কিছুটা আমি মানব। অন্তত এটুকু স্বীকার করব যে, সব বাঙালি না হলেও এই জাতির মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা কেবল দেবতা নন, উদ্যমে, মনুষ্যত্বে ও অজেয় শক্তিমত্তায় দেবতাদেরও ছাড়ানো। তবে সংখ্যায় তাঁরা খুবই কম। আমার ধারণা, গড়পড়তা বাঙালি মানুষ হিশেবে খুবই সাধারণমানের। গড়পড়তা ইয়োরোপীয়, মঙ্গোলীয়, সেমেটিক বা কৃষ্ণাঙ্গদের পাশে গড়পড়তা বাঙালিকে কল্পনায় দাঁড় করিয়ে নিলে ব্যাপারটা সহজেই চোখের সামনে আমরা দেখতে পাব। বুদ্ধি আমাদের কারো চেয়ে কম নয়, আমার ধারণা অনেক জাতির চাইতে অনেক দিক থেকেই হয়তো তা বেশি; কিন্তু স্বাস্থ্যে, কর্মিষ্ঠতায়, উদ্যোগে উদ্যমে আমরা তাদের চাইতে অনেক নিচে। ফলে ওই বুদ্ধিমত্তা ফলপ্রসূ হতে পারেনি। আশি থেকে নব্বই ভাগ বাঙালির মধ্যে এমন একটা আত্মঘাতী উদ্যমহীনতা রয়েছে, রয়েছে এমন এক সুগভীর নিষ্ক্রিয়তা যা উৎরে এই জাতি কখনো শক্তির শীর্ষ স্পর্শ করতে পারবে এ কিছুতেই মনে হতে চায় না। শক্তি, উদ্যম ও বৈচিত্র্যশূন্য আমাদের গড়পড়তা বাঙালির জীবন। বিদ্যাসাগরের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "বিশ্বকর্মা যেখানে চারকোটি বাঙালি নির্মাণ করেতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।" আমার ভয় হয় আমাদের আরও অনেকদিন পর্যন্ত অমন বাঙালিই থেকে যেতে হয় কিনা।

আমার এক বর্ষীয়ান বন্ধুকে (যিনি পেশাগত জীবনে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করেছেন) আমি একবার বলেছিলাম যে মোটামুটিভাবে যোগ্য, সমর্থ ও শক্তিমন্ত মানুষ আমাদের দেশে বিশজনে একজনও হবে কিনা সন্দেহ।

শুনে উনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, আমার মনে হয় পার্থক্যটা আরও একটু বেশি।

আমি সাগ্রহে জানতে চেয়েছিলাম, কত?

উনি শান্তভাবে বলেছিলেন, তিরিশ হাজার।

হয়তো কথাটা উনি কিছুটা রসিকতা করে বলেছিলেন, হয়তো বলেছিলেন প্রতীকী অর্থে, হয়তো সুগভীর বেদনা ও হতাশা থেকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, আরও অনেক অনেক বেশি। কিন্তু ধরা যাক, অত বেশি না হয়ে যদি কেবল বিশজনে একজনই হয়, তাহলেই বা চিত্রটা কেমন?

আগেই বলেছি কর্মোদ্যোগের অভাবে আমাদের সব উদ্যম, সপারগতা, বুদ্ধিমত্তা সামাজিক স্বার্থরক্ষার বদলে ব্যবহৃত হতে থাকে ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার ছোট্ট কুঠুরিটুকুর জন্যে। শক্তি কম বলে আমরা পৃথিবীকে জয় করতে পারি না, নিজের

সামান্য যা শক্তি আছে তা ব্যয় করি শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্যে; এভাবেই টিকে থাকতে চেষ্টা করি। তাই ব্যক্তিগত স্বার্থ হাতিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের বুদ্ধি যে-পরিমাণ টনটনে, সামাজিক স্বার্থের বেলায় তা ঠিক সে পরিমাণেই ভোঁতা। একটা গল্প বলে উদাহরণ দিই :

কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ বাংলামোটর এলাকায় রাস্তার দুদিকেই ফুটপাথের প্রস্থ গড়গড়তা চার ফুট। একদিন দেখলাম শ্রমিকেরা ঐ ফুটপাথগুলোর পুরু কংক্রিট কেটে তার ওপর সাত ফুট পরপর ফুট-তিনেক ব্যাসের একটি করে গোল গর্ত করছে। শ্রমিকদের কাছ থেকে জানতে পারলাম, ঐ গর্তগুলোতে বকুল গাছ লাগানো হবে। শুনে খানিকটা বোকাই হয়ে গেলাম। ফুটপাথ তৈরি করা হয়েছে মানুষ হাঁটার জন্য. সেখানে এত বিরাট গাছ গালানো হচ্ছে কেন? আর পুরো ফুটপাথ জুড়ে যদি শুধু গাছই দাঁড়িয়ে থাকে তবে মানুষ চলবে কোন্‌খান দিয়ে? হত ফুটপাথ দশফুট চওড়া, তাও একটা কথা ছিল, কিন্তু যে-ফুটপাথে দুজন মানুষ পাশপাশি হাঁটতে গেলে ধাক্কা খায় সেখানে কি এত বিরাট গর্ত করে গাছ লাগানোর কথা ভাবা যায়! আপনারা জেনে অবাক হবেন যে বছরের পর বছর ধরে ঘটেছে ঘটনাটা। প্রতিবারই গাছ লাগানো হয়েছে, প্রতিবারই ছ'মাসের মধ্যে মানুষের টানাহেঁচড়া আর পায়ের চাপে সে-গাছ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবু ঐ গাছ লাগানোর কাজ বন্ধ হয়নি। আমার কেবলই মনে হয়েছে সিটি কর্পোরেশনের যে প্রধান প্রকৌশলীর নির্দেশে এই কাজটি হচ্ছে, কী করে তাঁর পক্ষে এতখানি নির্বোধ হওয়া সম্ভব হল! প্রথমত ঐ দুরূহ কঠিন কংক্রিট কষ্ট করে কাটতে হবে, তারপর সেখানে এমন গাছ লাগানোর চেষ্টা করা যা ওখানে কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারবে না-- এসব জেনেও কী করে তিনি এ পারলেন? রাস্তার সামান্যতম লোকও যা বুঝতে পারে, তিনি কি তা-ও বুঝতে পারেন না! তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার, একেবারে মেধাহীন তো তিনি নন! তাহলে কেন এতটুকু বুদ্ধি তাঁর মাথায় আসে না। নিজের স্বার্থের ব্যাপারে তো তিনি এমন নির্বোধ নন। সেখানে সবই তো বোঝেন তিনি। বাড়ি-গাড়ি, ব্যাংক-ব্যালান্স, উৎকোচ কোনোখানেই তো তাঁর বুদ্ধির কমতি নেই! তাঁর যত নির্বুদ্ধিতা সব সমষ্টির স্বার্থের বেলায়। এখানে তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে নিরেট মানুষের চেয়েও নিরেট।

এখানে কেউ বলতে পারেন জনস্বার্থরক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার জন্যে বা জনগণের অর্থ অপচয় করার জন্যে যদি তার শাস্তির ব্যবস্থা থাকত অর্থাৎ নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ বিপন্ন হবার সম্ভাবনা থাকত তবে হয়তো এ-ব্যাপারে তিনি আরও সতর্ক হতেন, আরও কিছুটা বুদ্ধি ব্যয় করতে উৎসাহী হতেন। অথবা যদি ঐ কাজের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্যে তার পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকত তবেও হয়তো তিনি কিছুটা সক্রিয় থাকতেন। আসলে পুরস্কার বা তিরস্কার কোনোটাই না-থাকায় তিনি অমনটা করে চলেছেন।

কিন্তু আমার প্রশ্ন : পুরস্কার বা তিরস্কার কিছুই সেখানে নেই বুঝতে পারছি। কিন্তু তিনি তো অন্তত একজন বুদ্ধিমেধাসম্পন্ন মানুষ। তাঁর মানবিক বিবেক বলে তো অন্তত কিছু একটা আছে! 'পুরোপুরি অর্থহীন' যে-কাজের জন্যে বছরের-পর-বছর জনগণের বিপুল অর্থ নষ্ট হচ্ছে, সে-অর্থ ব্যবহারের ন্যায্যতা নিয়ে তিনি কি এক মুহূর্তের এতটুকু চিন্তাও দেবেন না? যে-কোনো দেশের যে-কোনো মানুষই তো তা দিত। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য : তিনি এটুকুও দেবেন না। বিনা ব্যক্তিগত লাভে এতটুকু চিন্তার জন্যে যে-শ্রম দিতে হবে তা সত্যি সত্যি তিনি দেবেন না। কারণ ঐ শক্তিটুকু তার মধ্যে আসলেই নেই। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষা এবং তাকে পরিপুষ্ট করতে করতে অন্যসব কিছুর মতো তার মেধার সবখানিই শেষ হয়ে গেছে। এর বাইরে, এমনকি বিবেকের তাগিদেও, দেবার মতো কিছু তার নেই। এই হল আমাদের কর্মোদ্যোগের গড়পড়তা পরিমাণ।

আমাদের দেশে সমর্থ মানুষের সংখ্যা মোটামুটিভাবে বিশজনে একজন বলে এদেশের প্রতিটি শক্তিমান মানুষকে সারাজীবন চারপাশের উনিশজন মানুষের ভার বয়ে বেড়াতে হয়। একজন মানুষের পক্ষে, সে যত শক্তিমানই হোক, এত বিপুল বোঝা বহন করা সম্ভব নয়। তাই প্রকৃতির নিয়মেই এক সময় সে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। এইভাবে এই সমাজ থেকে নেতৃত্বের মৃত্যু হয়। যদি এভাবে সে না মরে তবে আমাদের ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষা ও সহিংসতা দিয়ে আমরা তাকে ধীরে ধীরে মেরে ফেলি। বাঙালি জাতির সবচেয়ে অপরাজেয় ও পরাক্রান্ত মানুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর। দধীচির অস্থি ছিল তাঁর শরীরে। কিন্তু তিনিও বাঙালির এই বিপুল অক্ষমতার আর ক্ষুদ্রতার চাপ শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে পারেননি। শেষ বয়সে মানসিকতভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় বাংলাদেশ ছেড়ে সাঁওতাল-পরগনায় চলে গিয়েছিলেন। যাবার আগে বলে গিয়েছিলেন : দেশটার ওপর থেকে যদি বেশ কয়েক হাত মাটি তুলে ফেলে দেওয়া যায় তাহলে এই জাতির কিছু আশা থাকলেও থাকতে পারে, না হলে কিছু হবে না। আমাদের বিপুল জনগোষ্ঠীর অক্ষমতা আর নিষ্ক্রিয়তার এই-যে ভয়াবহ চাপ, তা আমাদের জাতির শক্তির কেন্দ্রগুলোকে নিয়ে নিজের ওজনে নিজেই কেবলি নিচের দিকে তলিয়ে যেতে থাকে।

২

একটা গভীর অসহায়তা এবং অপারগতার অনুভূতি আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষের অস্তিত্বকে অধিকার করে আছে। আমরা-যে কোনোদিন অর্থপূর্ণ বা বড়কিছু করতে পারব তা আমরা, এদেশের অধিকাংশ মানুষ, বিশ্বাস করতে পারি না। ইয়োরোপ-আমেরিকা বা জাপানের মানুষদের মতো আমরাও-যে সবরকম শক্তিসম্পন্ন সার্বভৌম মানুষ এবং তাদের মতো আমরাও যে পৃথিবীকে জয় করতে

পারি তা কিছুতেই আমাদের মাথার ভেতর আসে না। কুসংস্কারের মতো এই অবিশ্বাস আমাদের ভেতরে বদ্ধমূল। এ-ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করলেও আমাদের মুখে অবিশ্বাসের হাসি দেখা যায়। যেন চিরকাল নিচে-থেকে যাওয়াটা আমাদের অপরিবর্তনীয় বিধিলিপি। আগেই বলেছি আমাদের ইতিহাসের কোনো পর্বে নিজেদের ভাগ্য আমরা নির্মাণ করিনি, আমাদের যেটুকু যা করার তা চিরকালই অন্যেরা করে দিয়েছে। তাই কোনোকিছু করার কথা উঠলে আমাদের কাছে তা অবিশ্বাস্য ঠেকে। মনে করি কেউ যেন এসে তা করে দেবে। আমরা সবসময় কোনো আল-বোগদাদী বা আল-কান্দাহারীর প্রত্যাশাতে দিন গুনি। বাড়ির কাছে ডোবা পরিষ্কার করার দরকার হলেও নিজেরা তা না করে পত্রিকায় পাঁচপৃষ্ঠা লম্বা চিঠি লিখি এবং সরকার বাহাদুর যেন এদিকে সহৃদয় দৃষ্টি দিয়ে এই দুর্দশা থেকে আমাদের উদ্ধার করেন তার জন্যে আবেদন-নিবেদন করি।

১৯৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এমন একজন পাকিস্তানি মেজর (বাঙালি) ক্ষোভের সুরে আমাকে বলেছিলেন, পাঞ্জাবিদের মতো আমাদের কি যুদ্ধ করার উপায় আছে? যুদ্ধে যাবার সময় পাঞ্জাবি অফিসারদের গিন্নিরা স্বামীদের বলবে, 'নিজেকে দেখে রেখ। আমাদের জন্যে চিন্তা কোরো না। সবাই মিলে আমরা ঠিকঠাক সামলে নেব।' আমাদের গিন্নিরা উল্টো। আমরা যুদ্ধে যাবার সময় গিন্নিরা এমনই মরাকান্না শুরু করে দেয় যে যুদ্ধের পুরো উদ্যমটাই নষ্ট হয়ে যায়, সাহসটাই আর যেন থাকে না। এই কান্না কেবল যুদ্ধযাত্রী সৈনিকের স্ত্রীদেরই নয়, গোটা বাঙালি জাতির। আমাদের অস্তিত্বের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে এক নিঃসীম কান্না আর অসহায়তার পৃথিবী। সিরাজউদ্দৌলা নাটকে সিরাজউদ্দৌলা আলেয়াকে বলেছিল, 'বাঙালি জানে শুধু কাঁদতে।' কথাটা আদৌ মিথ্যা নয়।

বাঙালি কথায় কথায় কাঁদে। সিনেমায় নায়করাজ রাজ্জাক কাঁদে, কাঁদতে কাঁদতেই তিনি একসময় নায়করাজ হয়ে যান। উপন্যাসে কাঁদে ঔপন্যাসিক, শুধু কাঁদে আর কাঁদায়। প্রমথ বিশী লিখেছিলেন : যেখানে কান্নার কিছু থাকে সেখানে শরৎচন্দ্র তা চোখে আঙুল দিয়ে তো দেখিয়ে দেনই, যেখানে থাকে না সেখানেও আঙুলটাকে এতটা বাড়িয়ে দেন যে তা চোখের ভেতর গিয়ে পানি বের করে নিয়ে আসে। আমাদের 'ময়মনসিংহ গীতিকা'য় আছে : 'বাপ কান্দে মাও কান্দে কান্দে বিরিক্ষের পাতা'। আমাদের রূপকথার রাজা পুত্রের জন্যে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যান। এই না হলে আর বাপ কী?

কান্না আমাদের জীবনে জাতীয় ঐতিহ্যের ব্যাপার। কেউ না কাঁদলে আমরা তাকে অনুভূতিহীন বলি। পাশ্চাত্যের বাবা-মায়েরা উল্টো। ছেলেমেয়ে যাতে কঠিন পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার উপযুক্ত হতে পারে সেজন্যে তারা ছেলেবেলা থেকে তাদের সেভাবে গড়ে তোলে। আমি অন্তত তিনবার এমন দৃশ্য দেখেছি, যে তিন-চার বছরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে হাঁটার সময় ছেলেমেয়ে আছাড় খেয়ে

ফুটপাথ বা লনের ওপর পড়ে গেছে, কিন্তু বাবা-মা এগিয়ে গিয়ে তাদের হাত ধরে তোলেনি, দূর থেকে ইশারায় তাদের শুধু উঠে আসতে বলেছে।

কেন আমাদের মা-বাবারা অন্যরকম? কেন এত 'মুগ্ধ জননী' এদেশে? সন্তানের সামান্য কিছু হলে কেন তাদের ভেতরটা এমন হুহু করে ওঠে? কেন 'সোনা' 'মানিক' বলে তাদের বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে অকারণ আকুলতায় চোখ ভিজিয়ে তোলে? কেউ বিদেশে যাবার সময় তাকে বিদায় দেবার জন্যে কেন আমরা দলে দলে ভিড় করে বিমানবন্দরে একেকটা জনসভা বানিয়ে বসি? কেন আমাদের সঙ্গীত এক কান্নায় ভরা? কেন উদ্যম বা সাহসের এত অনটন? কেন আমাদের গানে প্রেমিক প্রেমে পড়ে শুধু কাঁদে। কেন গায় 'জীবনে যদি দীপ জ্বালাতে নাহি পার, সমাধি পরে মোর জ্বেলে দিও।' প্রেমে পড়েছিস, সুখের কথা। প্রেমিকাকে পেয়ে সুখী হতে চাইবি। কিন্তু মৃত্যুর পর কেন প্রেমিকাকে তোর সমাধিতে এসে আলো জ্বেলে দিতে বলিস? মরতেই তার যেন আসল উৎসাহ, প্রেমট্রেম কিছু নয়। কেন 'মেঘনাদবধ' কাব্যের রাবণ আর রাম শুধু কাঁদে? কেন এত অকারণ অবারণ কান্না? কেন এত অপরিসীম অক্ষমতার অনুভূতি? কেন আমাদের এত অসহায়তা? কেন পরিপূর্ণ বা বলীয়ান মানুষের মর্যাদাবোধ, শক্তি বা সংগ্রাম আমাদের মধ্যে খেলা করে না? সংগঠন তো শক্তিমান ও কর্মিষ্ঠ মানুষদের জগৎ! অস্তিত্ব জুড়ে এমন কান্নার পৃথিবী থাকলে আমরা সংগঠন গড়ব কী করে?

মানবজাতির সবচেয়ে মজবুত আর সংঘবদ্ধ সংগঠন সুসংহত অবয়বে গড়ে উঠেছিল আদিম সমাজগুলোয়। কেন হয়েছিল? কারণ সেগুলো ছিল সব শক্তিমান মানুষদের সংঘ। সেই বৈরী নিষ্ঠুর পরিবেশে দুর্বল অক্ষম অপারগ মানুষেরা বেঁচে থাকতে পারত না। প্রকৃতিই তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলত। দেশজোড়া এত অসহায় অপারগ মানুষ নিয়ে কী করে শক্তিশালী সংগঠন আমরা গড়ে তুলব এদেশে? কী করে গড়ে উঠবে সুসংহত রাষ্ট্র?

৩

আদিম সমাজের বিপদসঙ্কুল ও অনিশ্চিত পরিবেশে অক্ষম বা দুর্বল মানুষ টিকে থাকত না। কিন্তু আজকের উন্নত প্রযুক্তির যুগে তারা বেঁচে থাকার সুযোগ পাচ্ছে। তবু মনে রাখতে হবে সংগঠন দুর্বল মানুষের জিনিশ নয়। সংগঠন হল জীবনের ওপর মানুষের বিজয়ের প্রতিষ্ঠা; তার উচ্চতর জীবন ও সমৃদ্ধির সন্ধান। কাজেই সংগঠনের সবাই শক্তিশালী না হলেও বেশ কিছু মানুষকে অন্তত শক্তিশালী হতে হবেই। অন্তত সবলদের সমর্থন জোগাবার মতো ক্ষমতা তাদের অধিকাংশেরই থাকতে হয়। মানুষের অস্তিত্বের দিক দুটো। প্রথমত, সে চাকরি-বাকরি ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্যান্য বৈষয়িক কাজকর্ম করে। এসব দিয়ে সে তার জৈবিক অস্তিত্ব

টিকিয়ে রাখে। এতে তার শক্তির পুঁজির অনেকখানি অংশই খরচ হয়ে যায়, কিন্তু তবু সবটা শেষ হয় না। কিছুটা তখনও মজুদ থাকে। এই বাড়তি শক্তি দিয়ে সে গড়ে তোলে তার সমাজ, তার সংগঠন, তার রাষ্ট্র। এটা সে করে তার উচ্চতর জীবন-সমৃদ্ধির জন্যে। আমাদের মূল দুর্বলতা এই জায়গাটাতে। অস্তিত্বকে কোনোমতে টিকিয়ে রাখার মতো শক্তি হয়তো আমাদের অনেকেরই আছে। কিন্তু ঐ বাড়তি শক্তিটা, মানে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর' ক্ষমতাটা আছে খুব কম মানুষেরই।

ইয়োরোপে প্রতি তিনজন মানুষের মধ্যে একজন থাকে শক্ত-সমর্থ, বাকি দুজন থাকে মাঝারি শক্তির। ফলে প্রতি বিশজন মানুষের মধ্যে যোগ্য বা সমর্থ মানুষ পাওয়া যায় ছ-সাত জন, বাকিদের কিছু হয় মাঝারি মাপের, অন্যেরা সাধারণ মাপের। ফলে প্রতি বিশজন মানুষ কোনো উদ্দেশ্যে একসঙ্গে হলে অতি সহজেই একটা শক্তপোক্ত সংগঠন গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু আগেই বলেছি, আমাদের দেশে প্রতি বিশজন মানুষের মধ্যে শক্তিমান মানুষ কিছুতেই এক, খুব জোর দুজনের বেশি নয় এবং মাঝারি সামর্থ্যওয়ালা মানুষের সংখ্যা চার থেকে পাঁচ। বাকিরা একেবারেই অসহায় পর্যায়ের। এই সংখ্যা দিয়ে বিশজনের একটি সংগঠন গড়া ও তাদের টিকিয়ে রাখা কঠিন। টেকাতে পারলেও তার ভেতর অন্তর্গত দুর্বলতা থেকে যায়। এ থাকে দুটো কারণে। এক. এখানে বিশজনের মধ্যে ঐ চৌদ্দ-পনেরোজন কেবল অসহায় বা অক্ষম নয়; রীতিমতো নিস্পৃহ এবং অসার। তারা সংগঠনের আদর্শ উদ্দেশ্য সবই বোঝে, ঘন ঘন শিরশ্চালন করে সব প্রস্তাবই সমর্থন করে কিন্তু সক্রিয়ভাবে উৎসাহ ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে না। কাজেই ওই বাকি পাঁচ-ছয়জন (যাদের মধ্যে এক বা দেড় জন সমর্থ আর চার-পাঁচজন আধা-সমর্থ) নিজেদের ভার বহনের পর বাকি পনেরোজনের ভার বহন করতে পারে না। প্রথম কিছুদিন হয়তো তারা উদ্দীপনার তাগিদে এই বিরাট ওজন টানার কাজটা কোনোমতে চালিয়ে নেয় কিন্তু একসময় তাদের শক্তি ফুরিয়ে আসে। হয়তো তারা তখনো মাঠে টিকে থাকে কিন্তু তার অবস্থা হয়ে আসে সব-ক'টি ছেলে হারানো হারাধানের দশম ছেলেটার মতো :

হারাধনের একটি ছেলে
কাঁদে তেউ ভেউ,
মনের দুঃখের বনে গেল
রইল না আর কেউ।

ছেলেটির মতো তারাও মনের দুঃখে বনে চলে যায়। আর এভাবে আমাদের সংগঠনগুলোর একসময় বিলুপ্তি ঘটে। আমাদের সংগঠনগুলোর শুরু হয় উৎসাহের

উদ্দীপনার সঙ্গেই, কিন্তু তারা টেকে না। রবীন্দ্রনাথ-যে বলেছিলেন, আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না, তার কারণ এ-ই।* প্রথম মানুষটি কোনোমতে সংগঠনটি দাঁড় করাতে পারলেও ঐ দায়িত্বে তার যোগ্য উত্তরাধিকারী মেলে না। পরের মালিকেরা উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া সংগঠনের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ইটকাঠগুলো এক এক করে বিক্রি করে, খেয়ে, সংগঠনের পুরোপুরি অবসান ঘটিয়ে দেয়। এভাবে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায় আমাদের দেশের সংগঠন।

৪

সংগঠনগত এই দুর্বলতা কেবল বাঙালির নয়, সারা ভারতেরই যুগ-যুগের একটা সমস্যা। প্রাচীন ভারত তার এই দুর্বল সাংগঠনিকতার একটা নিখুঁত মডেল রেখে গিয়েছে রামায়ণের কাহিনীতে। তবে সেখানে সত্যিকার সমর্থ মানুষের সংখ্যা বাঙালিদের মতো বিশজনে একজন নয়, চারজনে একজন। রাম সেখানে আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্বামী, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পিতা, আদর্শ রাজা—সবকিছুরই আদর্শ। সমস্ত দায়দায়িত্ব, দুঃখ-নিগ্রহ, সংগ্রাম-দহনের যাবতীয় দায়ভার একমাত্র রামের। লক্ষ্মণ আধা-সমর্থ মানুষ, শক্তি আছে মেধা নেই, বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়িয়ে রামকে সহযোগিতা দেয়, এই। বাকি দুজন রামের পাদুকা সিংহাসনের ওপর বসিয়ে রাজ্য শাসন করে। এই হল মডেলটির রূপরেখা। এক্ষেত্রে রামের মতো এমন সর্বদায়িত্ব-নিপিষ্ট মানুষের পক্ষে দুটো পরিণতির পথই কেবল খোলা থাকতে পারে : এক. এই পর্বতপ্রমাণ যন্ত্রণা আর দায়িত্বের ভার বহন করে তিলে-তিলে নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া। দুই. (বাকিরা সীমাহীনরকমে অক্ষম বলে) প্রতিটি কাজে অতিলৌকিক শক্তিমত্তা বা ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া অর্থাৎ নিজের ক্ষমতার ওপর অমানুষিক চাপ দিয়ে নিজেকে দিয়ে নিজের সাধ্যাতিরিক্ত এমন অসম্ভব কিছু করা যা দৃশ্যত প্রায় ঐশ্বরিক। এর মাপ এত উঁচু যে এর ফলে

---

* বিদ্যাসাগর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটা বাক্যে সাধারণ বাঙালির শক্তিহীনতার যে-ছবিটি তুলে ধরেছেন তার চেয়ে সম্পূর্ণ ও বিশদ চিত্র আর কেউ দিতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। গভীর বেদনা থেকে লেখা সেই অনুপ্রাণিত বাক্যগুলো সংক্ষিপ্ত কিন্তু অন্তর্ভেদী।
"আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; অনুষ্ঠান করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহ আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স, এবং নিজের বাকচাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।"

ঈশ্বরের অবতার বলে আখ্যায়িত হওয়া ছাড়া তার কোনো উপায় থাকে না। এবং তিনি তা হয়েছিলেনও। কেবল তিনি নন, প্রাচীন ভারতে প্রধান সাংগঠনিক নেতারা এই কারণে সকলেই 'প্রায় ঈশ্বর'। অবতার।

একটি সংঘের প্রতি চারজনের একজনও যদি শক্তিমান হয়, তা হলেও, সে-সংঘটি মোটামুটিভাবে গড়ে উঠতে পারে। প্রমাণ, ঐ সাংগঠনিক ভিত্তি নিয়ে তিনি রাবণকে পরাজিত করতে ও রাজ্য শাসন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ঐ একজন যদি বিশজনে একজন হয়, তাহলে এটা সম্ভব হয় না। এর প্রমাণ, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারত অনেক সক্ষম ও সমর্থ সংগঠন গড়ে তুলতে পেরেছিল, যা বাঙালিরা পারেনি।

এখন প্রশ্ন হতে পারে : বাঙালিদের সব সংগঠনই-যে দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যায় তা তো নয়, সাম্প্রতিকালের বেশকিছু সংগঠন তো বেঁচেও আছে! কেবল বেঁচে আছে নয়, বেশ লম্বা সময় ধরেই বেঁচে আছে। এ ব্যাপারে আমার উত্তর : এরকম প্রতিষ্ঠান নেই তা নয়, কিন্তু এগুলোর সংখ্যা বেশি নয়। এদেশের এন.জি.ও.-গুলো এই দলের। এদের অনেকগুলোই দীর্ঘ সময় টিকে রয়েছে কিন্তু তা অন্য কিছু কারণে। এক. এরা আমাদের জাতির যুগ-যুগের সাংস্কৃতিক অসহায়তার ভেতর থেকে—এই জাতির বিশৃঙ্খলা, অক্ষমতা ও দুর্বলতাগুলোকে অঙ্গীকার করে জেগে উঠছে না। আমাদের সমাজের কাছে এদের কোনোরকম জবাবদিহিতাও নেই। বিদেশ থেকে ফান্ড আসছে আর তার সঙ্গে আসছে বিদেশি ব্যবস্থাপনা। তাই দিয়ে যান্ত্রিকভাবে, মানুষের ইচ্ছা-অনুভূতিকে উপেক্ষা করে এগুলো তৈরি হচ্ছে এবং চালু থাকছে। বহুজাতিক কোম্পানির ব্যবসাগুলো যে-কারণে এদেশে পালতোলা নৌকার মতো তরতরিয়ে এগিয়ে যায়, এরাও অনেকটা সে-কারণেই বেঁচে আছে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে, যখন বিদেশি সহযোগিতা বিলুপ্ত হবে, যখন তাদের কাজ করতে হবে আমাদের সংস্কৃতি ও মনমানসিকতার ভেতর থেকে—স্বকীয় আত্মশক্তির ওপর নির্ভর করে—আমাদের দেশের এইসব অসহায় মানুষ আর তাদের ব্যর্থতা ও আত্মঘাতী প্রবণতাগুলোকে অঙ্গীকার করে—তখন তারা কতটুকু কী করতে পারবে তা আমাদের দেখতে হবে।

৫

আমরা কেন সংগঠন গড়ে তুলতে পারিনি তার কারণ খুঁজতে গিয়ে বাঙালির দুটো বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি : এক. তার একাকিত্ব তথা আত্মকেন্দ্রিকতা; দুই. তার অসহায়তা। কর্মের ক্ষেত্রেও তার রয়েছে এক অপরিসীম নিস্পৃহতা ও অসারতা। আমার ধারণা এই জিনিশগুলোই বাঙালিকে সংগঠন নির্মাণের ব্যাপারে অনেকখানি অনুপযুক্ত করে দিয়েছে। কেবল তাই নয়, এই উপাদানগুলো নানান

ক্ষতিকর রূপে এবং অবয়বে জীবনের চৌহদ্দিতে ফিরে ফিরে দেখা দিয়ে আমাদের সংগঠনের সম্ভাবনাকে দুর্বল করে ফেলেছে।

অক্ষমতা এবং অসহায় মানুষের একটা বড় লক্ষণ ভীরুতা। শক্তিমান মানুষ যেমন বিরুদ্ধতাকে আক্রমণ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে, শক্তিহীন মানুষ তেমনি বিপদ দেখলে পালাতে চায়। সবকিছুকেই সে ভয় পায়। তার মধ্যে কাজ করে নিজের গভীর হীনমন্যতাবোধ, নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে এক বদ্ধমূল ধারণা। প্রতি মুহূর্তে চিশ্চিহ্ন হবার আতঙ্ক তাকে আমুণ্ডুপদনখ গ্রাস করে রাখে বলে সামান্য পাতা নড়ার শব্দে তার বুক কেঁপে ওঠে। জীবন হারানোর আশঙ্কা তার বেশি বলে জীবন তার কাছে হয়ে উঠতে থাকে মূল্যবান। ফলে জীবন হারানোর ভয় তার আরও বেড়ে যায়।

১৯৬৯ সালের একটা দৃশ্য এখনো আমার চোখের সামনে ভাসে। ঢাকায় বাঙালি-বিহারিদের মধ্যে একটা টেনশন চলছে দিনকয়েক ধরে। মাঝেমধ্যে দুয়েকটা ছুরি-মারামারির ঘটনার কথাও শোনা যাচ্ছে। বিহারিরা থাকত মিরপুর আর মোহাম্মদপুর এলাকায়, তারা দিনকয়েক ধরে শহরের দিকে বেরোচ্ছে না, নিজ নিজ এলাকাতেই গুটিয়ে রয়েছে। আমি তখন ঢাকা কলেজে পড়াই। একদিন বিকেল তিনটা-চারটার দিকে কলেজ গেট দিয়ে বেরোচ্ছি, হঠাৎ দেখি রাস্তার লোকজন শুধু ফিরে-ফিরে মোহাম্মদপুরে দিকে তাকাচ্ছে আর আজিমপুরের দিকে দৌড়োচ্ছে। প্রথমে দশে-বিশে, তারপর শ-য়ে শ-য়ে, শেষের দিকে মনে হল হাজারে লাখে। এভাবে পাগলের মতো কেন ছুটছে জিগ্যেস করলে কোনো সদুত্তর নেই। সবার মুখেই এলোপাতাড়ি কথা : 'বিহারিরা আইসা পড়েছে।' 'আরে ভাই পালান শিগ্রি।' 'আবার কথা? ভাগেন।' একেক উদভ্রান্ত গলায় একেক আতঙ্ক আর ধমক। কেউ বলে শুক্রাবাদ পর্যন্ত এসে গেছে, কেউ বলে ধানমণ্ডি। ঊর্ধ্বশ্বাসে শুধু পালাচ্ছে সকলে। অসংখ্য মানুষ এমনভাবে ছুটছে যে মনে হল নিউমার্কেট, আজিমপুর, লালবাগ পেরিয়ে এতক্ষণে হয়তো গোটা শহর গিয়ে বুড়িগঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নানান জনের সঙ্গে কথাবার্তা থেকে আস্তে আস্তে আসল ব্যাপারটা স্পষ্ট হতে ঘণ্টাখানেক লাগল। এমন কিছুই নয়। বাঙালিরা মোহাম্মদপুর আক্রমণ করতে আসছে শুনে কিছু বিহারি ছেলে লাঠি, ছুরি, রামদা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। এই যা। হয়তো প্রত্যক্ষদর্শী ছিল দু-চারজন। কিন্তু মুহূর্তে সেই আতঙ্ক এমন দাবানলের মতো ছড়িয়ে গেছে যে চোখের পলকে অমন হুলস্থূল দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। সেদিন আমাদের পলায়নপরতার যে-দুঃখজনক রূপ চোখের সামনে দেখেছিলাম, তা আমাকে অনেকদিন পর্যন্ত বিমর্ষ করে রেখেছিল।

এই কি আমরা? এমনি অসুস্থরকমে ভয়কাতর? এমনি প্রতিরোধহীন? আত্মসমর্পিত? এই দুর্বলতার জন্যই কি যুগ-যুগান্তর ধরে নানা জাতি আমাদের

শাসন করেছে? আমাদের এতসব অপমান, গ্লানি আর অসম্মানের মধ্যে পদানত করে রেখেছে? গাছ থেকে তুচ্ছ পাতা পড়ার শব্দে যদি আমাদের আপাদমস্তক কেঁপে ওঠে তবে আমাদের পক্ষে পৃথিবীর দুই সিং ধরে যুদ্ধ করে বিজয় রোজগার কতটুকু সম্ভব? রবীন্দ্রনাথ এ-কারণেই কি লিখেছিলেন : 'ওরে ভীরু তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার?' এমন অসীম ভীরুতা বুকে নিয়ে জীবনের ওপর কী করে আমরা বিজয়ের পতাকা ওড়াব? ৭১-এর যুদ্ধে এদেশে বহু দুঃসাহসী মানুষ দেখেছি আমরা। জাতীয় যুদ্ধের শঙ্খরব থেকে জেগে উঠেছিল তারা। অতীত ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়েও তাদের আমরা দেখেছি। কিন্তু এরা তো ব্যতিক্রমী সময়ের ব্যতিক্রমী মানুষ! জাতির দুর্ধর্ষ সন্তান। কিন্তু সাধারণ মানুষের অবস্থা কী? সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত? সেই বিশজনের উনিশজনের অবস্থা? তারা তো এমনি! তাদের নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের ঐ দুর্ধর্ষ নেতাটি, আমাদের ঐ বিশতম ব্যক্তিটি শেষপর্যন্ত কতটুকু সুবিধা করতে পারবে?

৬

একটা জাতি চিরদিন একরকম থাকে না। এ জাতিও থাকবে না। আজ এদেশে যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সূচনা ঘটেছে, তার তীব্র হিংস্র প্রতিযোগিতার ভেতর, তার দুঃসাহসী, নিষ্ঠুর ও কর্মমুখর পৃথিবীতে এই জাতির ভীরুতা-যে বেশকিছু কমে আসবে এবং কর্মোদ্যম বাড়বে এমন আশা সহজেই করা যায়। কিন্তু এযাবৎ আমাদের গড়পড়তা মানুষের অসহায়তা মনে হতাশা আনে! এটা বলছি এজন্য যে মানুষের জীবনে পঙ্গুত্বের যে-কয়টি প্রধান অনুঘটক রয়েছে ভীরুতা তারই একটি। ভীরুতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব আর হীনমন্যতাবোধ অন্তর্গতভাবে খুবই কাছাকাছি জিনিশ। এই হীনমন্যতাবোধ—যে মানুষের আপাদশির অস্তিত্বকেই কেবল পিষ্ট নিষ্ক্রিয় করে ফেলে তাই নয়, এর কারণে নিজেদের অর্জনকে পর্যন্ত মানুষ বিশ্বাস করতে পারে না। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে প্রায়ই আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলাতে আমাদের ফুটবলাররা খেলে ভালো, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধ-দলের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেও রাখে, বিরুদ্ধদলের খেলোয়াড়দের কাটিয়ে গোলকিপারের একেবারে সামনেও চলে যায় কেউ কেউ, এখন সামান্য একটু পা ছুঁইয়ে দিলেই গোল; কিন্তু ঠিক তখনই ঘটে এক আশ্চর্য ঘটনা। কী যেন ঘটে যায় তার মাথার ভেতর। সবাইকে অবাক করে আমাদের খেলোয়াড় আস্তে বলটা গোলকিপারের হাতে তুলে দিয়ে ফিরে আসে, অথবা এমনভাবেই কিকটা করে যে বলটা গোলপোস্টের অল্প ওপাশ দিয়ে বাউন্ডারি লাইনের বাইরে চলে যায়। এমন হওয়ার কারণ আছে। গোলের সামনে গিয়ে বলে কিক করার সময় স্ট্রাইকার হঠাৎ মানসিক বৈকল্যের শিকার হয়ে পড়ে। হঠাৎ মনে হয় : আমি বলটা গোলের ভেতর

ঠেলে দিলেই আকাঙ্ক্ষিত গোলটা হয়ে যাবে! এই আমি গোল দিয়ে ফেলব! আমাদের জাতীয় দল জিতে যাবে? কাল সারাদেশ সারাজাতির মুখে মুখে ঘুরে ফিরবে আমার নাম? খবরের কাগজ টিভি আমাকে নিয়ে উৎসবে ফেটে পড়বে? আমি হিরো হয়ে যাব? এত বড় মানসিক চাপ সে সহ্য করতে পারে না। তার হীনমন্যতার কারণে জাতীয় দল হেরে যায়। হীনমন্যতার জন্যে আমরা এভাবে নিজেদের অনেক যোগ্যতাকে অবিশ্বাস করে বসি, তুচ্ছ কারণে ন্যায্য পাওনাকে খুইয়ে ফেলি।

ভীরু, অক্ষম অসহায় মানুষের, হীনমন্যতাবোধসম্পন্ন মানুষের একটা অসুবিধাজনক দিক এই যে এই বিরুদ্ধ-পৃথিবী থেকে তারা কেবলই পালাতে চায়। পৃথিবীর কোনো সুদূর নিরাপদ কোণে নিজের একাকী অস্তিত্ব নিয়ে কোনোমতে টিকে থাকতে চায়। আপাতভাবে সবকিছুকে সে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার ভান করে, বড় বড় কথা বলে কিন্তু সেসব করে ঐ হীনমন্যতারই কারণে। এই দুর্ধর্ষ পৃথিবীটাকে তার বড় ভয়। পৃথিবীর সবকিছুর কাছে কেবলই পরাজিত হয়ে চলতে থাকায় তার সংকীর্ণ ছোট প্রকোষ্ঠের বাইরের সব জিনিশকেই সে আশঙ্কা আর সন্দেহের চোখে দেখে। প্রতিটি জিনিশকেই নিজের অস্তিত্বের জন্যে ক্ষতিকর মনে করতে থাকে। এইজন্যে তার পুরো চাউনিটিই হয়ে পড়ে নেতিবাচক। কোনো জ্বলজ্বলে বা অসাধারণ জিনিশ দেখলে সে বেশি করে ভীত হয়। মওকা বুঝে তাকে ধ্বংস করে দিতে চায়। এটাও করে সে কিছুটা ভীরুর মতো, নিজেকে যতটা পারে নিরাপদ রেখে। এই ভীরু, নির্বীজ মেরুমজ্জাহীন মানুষগুলো-যে ঠিক কেমন তার ছবি রেখে গেছেন ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর 'বুড়ি ইজেরগিল' গল্পের শেষ পর্বে। উজ্জ্বল অনিন্দ্যসুন্দর সে-গল্প সংক্ষেপে এরকম :

> অনেক যুগ আগে স্তেপে একজাতের লোক বাস করত। তাদের তিন ধারে ছিল জঙ্গল আর চতুর্থ ধারে স্তেপ। তারা যেমন ছিল স্ফূর্তিবাজ, তেমন ছিল তাদের গায়ের জোর ও সাহস। একদিন তাদের বরাতে দুঃখ নেমে এল। কোথা থেকে এক অন্য জাতের মানুষ এসে জঙ্গলে তাড়িয়ে দিল তাদের। সে জঙ্গল যেমন অন্ধকার তেমনি ভ্যাপসা। গাছগুলো অনেক পুরোনো, ডালপালাগুলো জড়াজড়ি করে আকাশকে পুরোপুরি রুখে দিয়েছে। সে জঙ্গলে জীবন বাঁচানো অসম্ভব। ওরা সামনে যেতে চেষ্টা করে, কিন্তু ওদের এগোবার সঙ্গে সঙ্গে সে জঙ্গল আরও অন্ধকার আর বিপদসংকুল হয়ে ওঠে। সবাই মৃত্যুর আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল। মেয়ে ও শিশুরা করুণ কান্নায় বিলাপ জুড়ল। কে আজ এগিয়ে আসবে তাদের উদ্ধার করতে? কে দেখাবে এই গহীন ভয়ংকর দুর্ভেদ্য অরণ্য থেকে নিষ্ক্রমণের পথ।
>
> শেষপর্যন্ত সত্যি সত্যি একজন উঠে দাঁড়াল তাদের মধ্য থেকে, যেমন উঠে দাঁড়ায় সবযুগে, সবখানে। সে সাহসী ডানকো। তাদেরই একজন। জোয়ান বয়স, সুন্দর চেহারা। সবাইকে সে ডেকে বলল : ওঠো, জঙ্গল কেটে আমরা সবাই রাস্তা করে

বেরিয়ে যাব। এ জঙ্গলের শেষ নিশ্চয়ই আছে। পৃথিবীর কোনোকিছুর শেষ না-থেকে পারে না।

ডানকোর আহ্বানে বন কেটে এগিয়ে চলল তারা। প্রচণ্ড তখন তাদের জীবন-উদ্দীপনা আর আত্মবিশ্বাসের উল্লাস।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, বন আরো ঘন আর বিপদসংকুল হয়ে উঠতে লাগল। গাছগুলো নিরেট দেয়ালের মতো আরও গভীর হয়ে পথ আগলে দাঁড়াল। একসময় এমন অন্ধকার ঘিরে এল যে মনে হল জঙ্গলের আদিকাল থেকে সবগুলো আঁধার রাত একখানে এসে জড়ো হয়েছে। সেই ভয়ংকর পরিবেশের মধ্যে বেঁচে থাকার কোনো আশাই রইল না। ব্যর্থতায় হতাশায় সবার ক্রোধ গিয়ে পড়ল ডানকোর ওপর। তারা চিৎকার করে বলল : 'হতভাগা, আমাদের যত দুঃখের জন্যে তুই দায়ী। তুই শেষ করেছিস আমাদের। এর জন্যে তোকে মরতে হবে। হয় এই অন্ধকারে আমাদের পথ দেখা, নয় মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হ।'

'তুই মরবি, তোকে মরতে হবে।' সবাই গর্জন করে উঠল সমস্বরে।

সবার জন্যে ভালোবাসায় প্রেমে ডানকোর সমস্ত অস্তিত্ব তখন দাউদাউ করে জ্বলছে।

চিৎকার করে উঠল ডানকো : 'কী করতে পারি আমি এই মানুষদের জন্যে। এই অন্ধকারে কোথা থেকে পাব পথ দেখানোর আলো!' বলেই হঠাৎ এক আশ্চর্য কাণ্ড করল সে। দুহাত দিয়ে নিজের বুকটা একটানে ছিঁড়ে ফেলে হৃদয়টাকে বার করে নিয়ে ডান হাতে তুলে ধরল মাথার ওপর।

সূর্যের মতো জ্বলতে থাকল হৃদয়টা, সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল। সারাটা জঙ্গল স্তব্ধ হয়ে গেল মানুষের প্রেমের সেই মহান আলোয়। মানুষগুলো বিমূঢ় হয়ে পড়ল।

'চলো, এগিয়ে চলো।' চিৎকার করে উঠল ডানকো।

ঢেউয়ের মতো সবাই পিছু নিল ডানকোর। ডানকো চলছে আগে আগে, আর তার হৃদয়টা অবিরত জ্বলছে হাতের মুঠোয়।

একসময় বন পার হয়ে খোলা জায়গায় গিয়ে পৌঁছাল সবাই। সবাই খুশিতে, উত্তেজনায়, আনন্দে মত্ত হয়ে উঠল। কিন্তু ডানকোর দু-ভাগ-হওয়া বুকের লাল রক্তের ধারা তখন দুর্বার হয়ে উঠছে।

সাহসী ডানকো জঙ্গল-পেরোনো খোলা জায়গার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল, সে-হাসি ভালোবাসার গর্বে ভরা। তারপর মাটিতে পড়ে গিয়ে মরে গেল।

আশায় আনন্দে ভরপুর মানুষেরা তাকিয়ে দেখল না যে ডানকো মরে পড়ে আছে। তার সাহসী হৃদয়টা তার লাশটার পাশে তখনো জ্বলছে। শুধু একজন ভীরু লোক তা দেখতে পেল। কিসের জন্যে ভয় পেয়ে যেন খুব করে মাড়িয়ে দিল সেই গর্বে-ভরা হৃদয়টা।...খানখান হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল সে হৃদয়ের শিখা, তারপর নিভে গেল।

আশ্চর্য বীরত্ব আর ভালোবাসার গল্পটার এখানেই শেষ। গল্পটার সব কিছু থেকে সরে এসে কেবল ঐ ভীরু লোকটার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে চাই আমি এখন। এখানে এই-যে হৃদয়-মাড়িয়ে-দেওয়া ভীরু লোকটা, এ-ই হল হীনমন্যতাসম্পন্ন মানুষের আসল চেহারা। এরা এমনি শিশুর মতো নিষ্ঠুর, নির্বিবেক। পৃথিবীর যাবতীয় সাফল্যের জ্বলজ্বলে আলোকে পায়ের নিচে অকারণে মাড়িয়ে খানখান করে দেবার জন্যে এমনি অবোধ নির্মমতা নিয়ে এরা প্রতীক্ষা করে। না করলে তারা নিজেদের নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

সব দেশেই এই মানুষ আছে। কিন্তু আমাদের দেশে এরা অনেক। ডানকোর গল্পটিতে ঐ জনগোষ্ঠীর ভেতর এরা সংখ্যায় ছিল একজন বা হয়তো আরও কিছু। কিন্তু আমাদের দেশে বিরাট সংখ্যক মানুষের মধ্যেই কমবেশি রয়েছে এই মানুষটি। এই মানুষটি আত্মঘাতী এবং নেতিবাচক। মানবসভ্যতার বিকাশে অবিশ্বাসী। সমস্ত ভালো বা সৎ প্রয়াসের ওপর তার অনাস্থা। নিজের জীবনে সাফল্য নেই বলে পৃথিবীর কোনো সাফল্যের ওপরেই তার তুষ্টি নেই। সবকিছুকেই সে পায়ের নিচে পিষে একাকার করে দিতে চায় এবং সুযোগ পেলেই সে তা করে। এই সমাজের সমস্ত সম্পন্ন বিকাশের সে ঘাতক, সমস্ত শুভ উদ্যোগের সে হত্যাকারী। এদের জন্যেই এই সমাজ এমন আত্মঘাতী, জাতীয় কর্মশক্তি এমন নিঃশেষিত। মানুষের সবরকম উৎসাহ ও উদ্যমকে দলে পিষে নিজেদের মৃত্যুর ভেতর না নিয়ে আসা পর্যন্ত এদের ক্ষান্তি নেই। পাশের বাড়ির লোক রুইমাছ খাচ্ছে দেখলে নিজের বাড়িতে বসে এরা একা-একা লেজ নাড়ে : 'রুই খায়...! জানি, জানি, এসব কোথা থেকে আসে! যেদিন ধরিয়ে দেব...' ইত্যাদি...। কিন্তু কথা হচ্ছে : 'ও রুই খাচ্ছে, তুই তাহলে কই খা। এমনভাবে পরিশ্রম কর যাতে তুইও রুই খেতে পারিস।' কিন্তু সেই অকর্মণ্য মানুষটি সেসব কিছুই করবে না, করার মতো শক্তিও নেই তার ভেতরে। সে কেবল বসে বসে অমঙ্গল চিন্তার পুরীষ ছড়াবে আর ক্লান্তিহীন চরিত্রহননে পরিপার্শ্বকে ক্লেদাক্ত করে চলবে। অন্যের যাবতীয় সাফল্যকে মিথ্যা প্রমাণ করে নিজেকে পৃথিবীব্যাপী ব্যর্থতার হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে।

৭

১৯৮৩ সালের দিকে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুজন বিশেষজ্ঞ-অধ্যাপক এসেছিলেন এদেশের সিভিল সার্ভিস সংস্কারে সহযোগিতা করতে। বিশেষজ্ঞ দুজনই আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন। সবে অস্ট্রেলিয়ার সিভিল সার্ভিসের পুনর্বিন্যাসে সহায়তা করে তাঁরা তখন বাংলাদেশে এসেছেন। এঁদের একজনের নাম আমার মনে আছে : অক্সেনহ্যাম। তাঁর সাথে আমাদের দেশের সিভিল সার্ভিস

নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলার সুযোগ হয়েছিল আমার। অক্সেনহ্যামকে বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের সমস্যা নিয়ে খুবই চিন্তিত আর বিচলিত মনে হল। হাসতে হাসতে বললেন : আমাদের এতদিনের বিদ্যাবুদ্ধি সব তোমাদের দেশে এসে বানচাল হতে বসল। কিছুতেই তোমাদের সিভিল সার্ভিসের সমস্যাটা বুঝে উঠতে পারছি না। কিছু দিয়েই এখানে কোনোকিছু ঠিকমতো চালানো যায় না। অসুবিধাটা কোথায়? কোথায় এর ভেতরের সমস্যা?

তাঁকে বেশ অসহায় লাগছিল। আমিও হাসতে হাসতে তাঁকে বললাম : কেবল তোমার দেশ নয়, সারা পৃথিবীর সব দেশের অভিজ্ঞতাকে একখানে করলেও এদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল অসুবিধা তুমি বুঝে উঠতে পারবে না। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর আসল মৃত্যু ঘটে এক অদৃশ্য ছুরির আঘাতে। সে আততায়ী নিঃশব্দ এবং অলক্ষ্য। কেউ তাকে কখনো দেখতে পায় না। তুমি বাইরে থেকে এসে হঠাৎ কীভাবে তাকে চিনবে? আমরা যতদিন পরাধীন ছিলাম ততদিন এই অদৃশ্য ঘাতককে আমরা দেখতে পেতাম না। শাসকদের পাশবিক শক্তির ভয়ে তারা পেছনে লুকিয়ে থাকত। দেশের ভেতর সংগঠন ছিল না বলেও তাদের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠত না। কিন্তু স্বাধীনতার পর সংগঠন গড়ে ওঠার পথ ধরে তারা তাদের অন্ধকার বিবর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

অক্সেনহ্যাম জিগ্যেস করলেন, কারা তারা?

আমি বললাম : দ্যাখো, তোমাদের দেশে দশজন মানুষ যদি একটা সংগঠন তৈরি করে তখন সেখানে থাকে চারটি দল। প্রথম দলে থাকে তিনজন। এরা সুইসাইডার; সংশপ্তক। সংগঠনের আদর্শের জন্যে এরা জন্মান্ধের মতো প্রাণ দেয়। এদের পরের দলে থাকে আরও তিনজন। এরা ঠিক সুইসাইডার নয় কিন্তু কাছাকাছি। প্রথম তিনজনকে প্রাণ দিতে দেখলে তারাও প্রাণ দিয়ে বসে। এর পরের দলে থাকে দুজন। এরা মাঝারি ক্ষমতার মানুষ; দ্বিধাগ্রস্ত। পালাবে, না সামনের দিকে যাবে বুঝে উঠতে পারে না। তবে সবাই সামনের দিকে যাচ্ছে দেখলে তারাও সামনে যাবার কথাই ভাবে। এর পরের বা শেষ দলে থাকে বাকি দুজন। এরা সমালোচক, ক্রিটিক। এরা কিছু করে না, শুধু বসে বসে লেজ নাড়ে আর কথা কয় : 'ভালো হত আরও ভালো হলে।' মোটামুটি এই হল তোমাদের সংগঠনের রূপরেখা। কিন্তু আমাদের দেশে যখন দশজন মানুষ একটা সংগঠন তৈরি করে তখন সেখানে এ-ধরনের দলের সংখ্যা চারটি থাকে না, থাকে পাঁচটি। এই পঞ্চমটিই আমাদের সংগঠনের মূল আততায়ী। কীভাবে তা বুঝিয়ে বলছি। আমাদের সংগঠনগুলোর প্রথম দলটিতে সুইসাইডার বা সংশপ্তক তোমাদের মতো তিনজন থাকে না, থাকে একজন। সংশপ্তক মানুষের এই স্বল্পতা আমাদের সংগঠনকে তোমাদের তুলনায় প্রথমেই অনেকখানি দুর্বল করে ফেলে। গোটা সংগঠনটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে একজন মানুষের ওপর এবং কোনোভাবে তার

পতন ঘটে গেলে পুরো সংগঠনটারই পতন হয়ে যায়। দ্বিতীয় দলে, আমাদের এখানে তোমাদের মতো তিনজন থাকে না, থাকে দুজন। জন্মান্ধ প্রেরণায় এরা জীবন উড়িয়ে দিতে না-পারলেও চোখের সামনে কাউকে আত্মোৎসর্গ করতে দেখলে সেই প্রেরণায় জ্বলে উঠতে পারে। তৃতীয় দলেও তোমাদের মতোই থাকে দুজন মানুষ, সেই ভীরু দ্বিধাগ্রস্ত লোক দুটি—পালাবে, না সামনের দিকে যাবে যারা বুঝে উঠতে পারে না। চতুর্থ দলে থাকে ক্রিটিকেরা। তোমাদেরই মতো 'ভালো হত আরও ভালো হলে'র দল। তবে সংখ্যায় তারা তোমাদের মতো দুজন নয়, একটু বেশি, তিনজন। কিন্তু পঞ্চম দলটি একেবারেই আমাদের স্বকীয়। এই দলটি তোমাদের অচেনা। হয়তো একসময় এদের তোমরা চিনতে। যিশুখৃস্টের তেরোজন অনুগামীর মধ্যে এ ছিল একজন। এরা ঘাতক; কিলার। প্রতি দশজনে আমাদের মধ্যে এরা দুজন। আমাদের জাতিগত অক্ষমতা, অসহায়তা, হীনমন্যতা এবং অমানবিক জীবন-পরিস্থিতির ভেতর থেকে জন্ম নিয়ে, জাতির প্রতিটা উদ্যমকে পেছন থেকে ছুরি মেরে মাটিতে শুইয়ে দেবার জন্যে এরা সবার আড়ালে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। এদের না-বুঝলে আমাদের সংগঠনের সমস্যাকে কোনোদিন বোঝা যাবে না। আমাদের সাংগঠনিক বিকাশের মূল আততায়ী এরাই। নানান রকম উৎসাহ আর প্রলোভন দিয়ে এদের অন্তত ক্রিটিক বা দ্বিধাগ্রস্তের স্তরে উন্নীত করতে না-পারলে আমাদের সংগঠনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত করা সহজ হবে না। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজও নয়। দেশের অধিকাংশ মানুষের অপারগতা, নিঃস্বতা ও পচনের ভেতর থেকে উঠে আসা এদের নিষ্পলক কঠিন আততায়ী হিমদৃষ্টি থেকে রেহাই পাওয়া খুবই কঠিন।

৮

আমাদের অক্ষমতা আমাদের জীবনকে প্রায় প্রতিটা জায়গায় ব্যর্থ করে দিয়েছে। পরের ভালো দেখলে তাই আমরা কষ্ট পাই, বিষণ্ন হয়ে পড়ি। অক্ষম মানুষ সাধারণত ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ মানুষ হয় পরশ্রীকাতর। পরশ্রীকাতরতা তাই আমাদের জীবনের সার্বভৌম অধীশ্বর। অক্ষমতার কারণেই আমরা এমন নেতিবাচক। আমরা যে-পরিমাণে নিষ্ফল, সেই পরিমাণেই নিন্দুক। নিন্দার ভেতর দিয়ে নিজেদের অক্ষমতার প্রায়শ্চিত্ত খুঁজি। একসময় শুনতাম পরশ্রীকাতরতা কথাটা নাকি বাংলাভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় নেই। পরে দেখেছি কথাটা ঠিক নয়। সব ভাষাতেই প্রায় কাছাকাছি অর্থের শব্দ রয়েছে। সব জাতির মধ্যে পরশ্রীকাতর মানুষ রয়েছে বলেই আছে। হিন্দু ধর্মচিন্তায় ছটি রিপুর কথা বলা হয়েছে। রিপুগুলো হল : কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। আমরা সবাই এই ছটি রিপুর প্রথম পাঁচটির অর্থ জানি, কিন্তু শেষ শব্দ অর্থাৎ মাৎসর্যের অর্থ অনেকেই জানি না। এই

মাৎসর্য শব্দটির মানে পরশ্রীকাতরতা। এ থেকে বোঝা যায় প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যেও পরশ্রীকাতরতা বেশ ভালোভাবেই ছিল।

কিন্তু সে যতই থাক, আমাদের মতো আপাদমস্তক পরশ্রীকাতরতা, এমন পরনিন্দাসর্বস্বতা হয়তো খুব অল্প জায়গাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে। আমাদের এই পরশ্রীকাতরতা জাতীয় ব্যাধির মতো। এ-যে কী নিষ্ঠুরতা আর হীনতায় ভরা তার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের গ্রামবাংলার মানুষের ক্ষুদ্রতা আর সংকীর্ণতায় ভরা সামাজিক চিত্রগুলো।

কেবল বিত্তবান-ভাগ্যবানদের শ্রীতেই-যে আমরা কাতর হই তা নয়, ক্ষুদ্রের শ্রীতেও আমরা কাতর হয়ে পড়ি। জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন : 'পরের মুখকে মলিন করে দেওয়া ছাড়া/অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ/নেই আর।' পরের মুখ এমনিতে মলিন হলে ভালো, না হলে নিজের ক্ষতি করে হলেও তা করতে হবে। আমাদের ভাষায় একটা প্রবাদ আছে : 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।' কী ভয়ঙ্কর কথা! অন্যের উচ্ছেদের জন্যে নিজের ওপর কী রক্তাক্ত আত্মঘাত! যতদূর মনে হয়, কাটা নাক অমঙ্গলের প্রতীক হয়েছে শূর্পণখার ঘটনা থেকেই। লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক কেটে দিয়েছিল বলেই রাবণ সীতাহরণ করেছিল, জন্ম নিয়েছিল রামায়ণের অমঙ্গলময় কাহিনীর। কোথাও যাত্রার সময় কাটা নাক দেখলে তাই আজও যাত্রাভঙ্গ হয়। এটাই হয়ে রয়েছে লোকাচার। এখন দেখুন পরের যাত্রা ভঙ্গ করার জন্যে কী করে এদেশের মানুষ। আমাদের বহু পরিচিত প্রবাদ—'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা'কে একটু উল্টেপাল্টে দেখুন কী এর আসল অর্থ। প্রথমে একটা ক্ষুর দিয়ে নিশ্চয়ই ঘ্যাচ করে নিজের নাকটা কেটে ফেলতে হয় তার। তারপর অন্যের যাত্রামুহূর্তে সেই রক্তাক্ত বীভৎস নাকটা বাড়িয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে হি হি করে হাসতে হয়। কী পৈশাচিক আনন্দ! কী রক্তঘাতী অট্টহাসি! 'হল তো যাত্রা ভঙ্গ তোর! এখন আর যেতে পারছিস না মর্কট। ভেবেছিলি শুভযাত্রায় বেরিয়ে একটা-ওটা হাতিয়ে ফিরবি। আমাদের বুকের জ্বালা বাড়াবি? নিজের নাক কেটে সেটা কেমন বন্ধ করলাম বল!'

না, আমরা বাঙালিরা নিশ্চয়ই সারাক্ষণ নিজ নিজ নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করি না। কথাটা নিশ্চয়ই প্রতীকী। কিন্তু একটা কথা। একটা জাতির প্রকৃত রূপ বা ছবিই তো থাকে তার সাহিত্যে, প্রবাদে-প্রবচনে! যে-জাতির প্রবাদে পরের শ্রী সহ্য করতে না-পারায় আত্মঘাতের এমন জিঘাংসাপূর্ণ চিত্র জন্ম নিতে পারে সে-জাতির মধ্যে পরশ্রীকাতরতা-যে নিষ্ঠুররকমেই আছে সে সন্দেহটা কি এমনই অমূলক?

হয়তো আমাদের জাতিগত দুর্বলতাগুলো একটু বেশি করেই তুলে ধরলাম। হয়তো একটু বেশিরকম বিশদভাবেই। কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট করে বলে রাখতে চাই যে নিজের জাতিকে হীন প্রতিপন্ন করার জন্যে এতসব বলিনি। কোনোরকম

ছিদ্রান্বেষণও আমার লক্ষ্য নয়। যে-আমি আমার জাতির আত্ম-অতিক্রমের পথ উৎসুকভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছি তার পক্ষে নিজেদের অক্ষমতাগুলো নিয়ে উৎসব করার অবকাশ কোথায়? আমি শুধু আমার জাতির দুর্বলতাগুলোকে সুষ্ঠুভাবে চিহ্নিত করতে চাচ্ছি। ব্যর্থতাকে পরাজিত করতে চাইলে এটা করা খুবই জরুরি। একটা উদাহরণ দিয়ে কথাটা বোঝাই। ধরা যাক, আমার টিবি হয়েছে। এখন আমি যদি সেটা মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখি, আর জবরজং স্যুট-টাই পরে সবার সামনে জাঁকালোভাবে বসে এমন একটা ভাব দেখাই যে আমার কিছুই হয়নি তবে কি আমার রোগ সারবে? সারবে না। টিবি সারাতে হলে আমাকে প্রথমে এই রোগটিকে চিহ্নিত করতে হবে। একে স্বীকৃতি দিতে হবে। আমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, তন্নতন্ন করে পরীক্ষানিরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে যে রোগটা সত্যি সত্যি কী ও কতদূর গভীরে সে শিকড় গেড়েছে। তবেই না চিকিৎসা করলে এ ভালো হবে! একটা জাতির ভবিষ্যৎ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যখন চারপাশের দালান-কোঠা সবই শুধু ধসে পড়ছে, তখন 'আমি সুস্থ আছি', 'আমি পৃথিবীর সবার ওপরে আছি'—এসব বলে ভুল আত্মপ্রসাদে ডুবে থাকার কোনো মানে নেই। সে সময় আমাদের নেই। বড় দ্রুত আজ আমাদের এগোতে হবে। আমাদের দেখতে হবে, আমাদের ব্যর্থতাগুলো কেন? কোথায় আমাদের ভুল, অপারগতা বা অক্ষমতা? আমাদের আসল রোগ কোন্‌গুলো ও কী কী! এসবকে ঠিকমতো শনাক্ত করতে পারলেই না জাতির উচ্চতর ভবিষ্যতের ব্যাপারে সুষ্ঠু পরিকল্পনা সম্ভব। ভুলগুলোকে শনাক্ত করতে হবে—কীভাবে সে ভুলগুলোকে কমিয়ে আনা যায় তার পথ বের করার জন্যে (শক্তিগুলোকেও খুঁজতে হবে সেগুলোকে বাড়িয়ে তোলার জন্যে)। শুধু ভালো দিকগুলো নিয়ে আত্মতৃপ্ত হয়ে থাকার চেয়ে এই কাজটা যত ভালোভাবে করা যাবে ততই তো জাতীয় ভবিষ্যৎ নিরঙ্কুশ হবে। এই দুর্বলতাসন্ধানকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াকেই বরং আমি আত্মহত্যা হিসেবে গণ্য করি।

সাংগঠনিক ব্যর্থতার মৌলিক কারণ : স্বাস্থ্যগত দুর্বলতা!

১

এখন আমার প্রশ্ন, আমাদের এই অক্ষমতার কারণ কী? যে-অক্ষমতা আমাদের এভাবে নিষ্ক্রিয় করেছে, ভীরু করেছে, নেতিবাচক করেছে, আমাদের মধ্যে হীনমন্যতা ও অসহায়তার বীজ বুনে দিয়েছে, শারীরিক ও মানসিকভাবে আমাদের এমন মেরুমজ্জাহীন করে রেখেছে; সে অক্ষমতা কিসের অক্ষমতা? এই অনটন কি বুদ্ধির? আমার আদৌ তা মনে হয় না। বাঙালির আর যে-অভাবের কথাই ভাবা যাক বুদ্ধির অভাবের কথা ভাবা খুবই কঠিন। যে-জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন জাতির রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে তার বুদ্ধি সাধারণত কম হয় না। এদেশের রিকশাওয়ালাদের মুখ থেকেও জীবন-দর্শন-রাজনীতি সম্বন্ধে যেসব বিস্ময়কর উক্তি শোনা যায় তা মাথা ঘুরিয়ে দেয়। বুদ্ধি কম থাকা তো দূরের কথা, বুদ্ধির দিক থেকে বাঙালি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কি না তাই নিয়েই বরং গবেষণা হওয়া উচিত। আমার বোনের সাড়ে তিন বছরের এক নাতি আছে। অসম্ভব বুদ্ধিমান সে। একদিন আমার বোনের এক ভাসুর তাকে জিগ্যেস করেছেন : 'আচ্ছা, বলো দেখি, এত বুদ্ধি নিয়ে রাতে তুমি ঘুমাও কী করে?' কথাটা শুনেই সে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে উঠল : 'তাই তো ভাবি নানা, রাতে আমার মাঝে মাঝে ঘুম আসে না কেন?' মাত্র সাড়ে তিন বছরের ছেলে! আমার তো মনে হয় সারা বাংলাদেশই ঐ ছেলেটার মতো। যে-দেশের মানুষের মগজ এমন উর্বর সে-দেশের মানুষকে বুদ্ধির ব্যাপার নিয়ে সন্দেহ করা সত্যি সত্যিই অপরাধ।*

---

* আমাদের প্রকৃত বুদ্ধি যতটুকু আমার ধারণা তার চেয়ে একটু বেশি করেই তা আমাদের চোখে পড়ে। বাস্তব জগতে ব্যর্থ মানুষকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে প্রতিমুহূর্তে বুদ্ধির ব্যবহার বেশি করতে হয়। আমাদের ব্যাপারেও হয়তো তাই। বুদ্ধির ব্যবহার বেশি হয় বলেই তাকে চোখে পড়ে বেশি। উদ্যম, শ্রম, সংগ্রাম দিয়ে কর্মজগতের ওপর আমরা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারি না বলেই জীবন সবসময় আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে যায়। অসংখ্য সমস্যা আমাদের বিপর্যস্ত করে রাখে। ফাঁদে-পড়া ইঁদুরকে যেমন নানান রকম বুদ্ধি খরচ করে বাঁচার চেষ্টা করতে হয় আমাদেরও হয়ত তেমনিভাবে বুদ্ধি দিয়ে সেই বিপন্ন অবস্থাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করতে হয়। বুদ্ধির এই অতি চর্চার প্রক্রিয়ায় আমাদের বুদ্ধির চেহারাটা তাই হয়ত অমন চকচক করে।

একই সাথে পরের কথাটিও মনে এসে যায়, যে জাতির এত বুদ্ধি তার কেন উন্নতি হয় না? আমাদের গোলমালটা কোথায়? অনটন কি আমাদের আবেগ-অনুভূতির জায়গায়? সেটাই বা কী করে সম্ভব? যে-দেশ কবিদের দেশ, যে-দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ শিল্পী; আবেগ-উচ্ছ্বাস যে-জাতির প্রধান গৌরব; সে দেশে আবেগের অভাব হয় কী করে? তাহলে কোথায় অসুবিধা?

২

আমার ধারণা একটা জায়গায় আমাদের একটা বড় ধরনের অনটন আছে। আমাদের দেশে আজ অব্দি কাজের সংস্কৃতি ভালোভাবে গড়ে ওঠেনি। একটা জাতির জীবনে কাজের বা পরিশ্রমের ঐতিহ্য গড়ে-ওঠা খুবই জরুরি। কাজ হচ্ছে গঙ্গাজল। সমস্ত অক্ষমতা ভাসিয়ে নিয়ে সে আমাদেরকে ফুরফুরে ভবিষ্যতের জগতে মুক্তি দেয়। আমাদের দেশে কাজের সংস্কৃতিক আজো গড়ে উঠতে পারেনি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির সূচনা ঘটলেও ব্যাপক অর্থে আমাদের এই নদীমাতৃক দেশটি এখনো রয়ে গেছে কৃষির যুগে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি জড়, স্থবির ও চলৎশক্তিহীন। তার উৎপাদনক্ষমতার ব্যাপারটি সামন্ত-শোষণ, জমির নির্দিষ্টতা ও উর্বরতার সঙ্গে বেদনাদায়কভাবে বাঁধা। মানুষের জীবন সেখানে নিয়তিনির্দিষ্ট এবং গতিহীন। ফলে এ-ধরনের সমাজে পরিশ্রম ও কাজের সংস্কৃতি প্রাণবান হতে পারে না। মূলত কৃষিভিত্তিক ও সামন্তপ্রবণতাসম্পন্ন বলে আমাদের সমাজও তা পারেনি।

কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রতিযোগিতামূলক, উদ্ভাবনময় ও অতন্দ্র। পরিবর্তন, নতুনত্ব ও কর্মমুখরতায় তা চঞ্চল ও উন্মাদ। এই অর্থনীতি হিংস্র আগ্রাসী। ব্যক্তিস্বার্থের পরিমাপহীন উদরপূর্তির প্রয়োজনে মানুষের কর্মশক্তির সম্পূর্ণতাকে শোষণ করে সে তাকে তার অন্তহীন ক্ষুধার অবিশ্রান্ত আহার্য বানায়। এই অর্থনীতির ভেতর বসে কারো পক্ষে কাজের বাইরে থাকা সম্ভব নয়। এতে জীবনের সুখশান্তি বাড়ুক না-বাড়ুক, কাজের সংস্কৃতি-যে প্রাণচঞ্চল হয় তাতে সন্দেহ নেই। আমরা আজ এই অর্থনীতির দিকে এগিয়ে চলেছি। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি এর দোরগোড়ায়। লুণ্ঠন ও দস্যুতার পথে পুঁজি সঞ্চয় করে এর ভিত্তিভূমি নির্মাণ করছি। অচিরেই এই অর্থনীতির ব্যাপক আওতায় আসবে আমাদের জাতীয় জীবন। এর ফল হিসেবে হয়তো কর্মোদ্দীপনা আমাদের জাতির ভেতর শুরু হবে। আমি ভুলিনি যে এই অর্থনীতির মূল জায়গাটা যেমন বীভৎস তেমনি নির্মম। কিন্তু আমাদের বর্তমানের নিঃস্বতা তার চেয়েও নির্মম নয় কি? আমার ধারণা আমাদের দেশে এই অর্থনীতি যতদিনই বাঁচুক, আমাদের যুগ-যুগের জড়ত্ব ও স্থবিরতাকে সরিয়ে এ-যে সৃজনশীলতা এবং কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে আমাদের জাতীয় জীবনকে গতিশীল ও কর্মমুখী করবে তাতে সন্দেহ নেই। এটা সফল হওয়ার সঙ্গেই ঘটতে

পারে আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত—অপুষ্টি ক্ষুধা, দারিদ্র্য, কর্মবিমুখতা, আলস্য বা নিষ্ক্রিয়তা থেকে আমাদের মুক্তির সময়। এই অর্থনীতির সতেজ হাওয়া, আমাদের সাংগঠনিক সম্ভাবনার মরা পালেও বেশকিছুটা গতিবেগ এনে দিতে পারে এবং উপজাত হিসেবে নিষ্ক্রিয়তা ও অক্ষমতার বেশকিছুটা উন্নতি ঘটাতে পারে। তবু আমরা যেন না ভুলি যে আমাদের দেশে ঐ অর্থনীতিরও সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে সংগঠন গড়ে তোলাকে আমরা কতটা জান্তবভাবে কামড়ে ধরতে পারলাম, তার সাফল্য কতটা ঘটল তার ওপর।

৩

তবু আমার মনে হয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পাশাপাশি আমাদের নিষ্ক্রিয়তার একটা বড় কারণ আমাদের স্বাস্থ্য। এ বোঝার জন্যে অন্তর্দৃষ্টির দরকার নেই, শাদা চোখই যথেষ্ট। আমি এ-পর্যন্ত অনেক দেশে গেছি, কিন্তু বাঙালির চাইতে খারাপ-স্বাস্থ্যের মানুষ আমি কোথাও দেখিনি। হতে পারে, আমাদের চেয়ে খারাপ-স্বাস্থ্যের মানুষ পৃথিবীতে আছে। তাহলেও একটা কথা থেকে যাবে : আমাদের স্বাস্থ্য যথেষ্টই খারাপ, পৃথিবীর যেসব জাতির স্বাস্থ্য খুবই মর্মান্তিক আমরা তাদের একটি। বাংলাভাষায় একটা প্রবাদ আছে : 'বসতে পেলে শুতে চায়।' এখন কথা হল বসতে পেলে যে শুতে চায়, শুতে পেলে নিশ্চয়ই সে ঘুমোতে চাইবে এবং ঘুমোতে পেলে মরতে। অর্থাৎ প্রবাদটি এক কথায়, আমাদের জাতিগত বিলুপ্তির ছবি। আগেই বলেছি একটা জাতির সাহিত্যে-শিল্পে, প্রবাদে-প্রবচনে সেই জাতির ভেতরকার চেহারাটা খুঁজে পাওয়া যায়। এগুলো একটা জাতির আয়নার মতো। তাতে জাতির স্বরূপ ধরা পড়ে। আমার ধারণা, এই প্রবাদের উৎস বাঙালির নির্জীবতা ও স্বাস্থ্যহীনতার গভীরে নিহিত। কেন বসতে পেলে শুতে চায়? শুতে চায় এজন্য যে বসে থাকতেও কিছুটা কষ্ট আছে, যা তার করুন স্বাস্থ্যে কুলিয়ে উঠতে চায় না। তার আসল বিশ্রাম শুতে পারায়।

এখন প্রশ্ন, প্রবাদটা তো উল্টোও হতে পারত। হতে পারত : 'বসতে পেলে দাঁড়াতে চায়'। দাঁড়াতে পেলে হাঁটতে চায়, হাঁটতে পেলে দৌড়োতে চায়, আক্রমণ করতে চায়, জয় করতে চায়, রাজ্য চায়, সাম্রাজ্য চায়, দরকারে সাম্রাজ্যবাদ চায়। অনেক জাতির প্রবাদেই তো এর কাছাকাছি কথা আছে। মোদ্দা কথা এই প্রবাদে রয়েছে আমাদের জাতির অবসন্ন শরীরের চেহারা। হয়তো আমাদের জাতিগত অক্ষমতার প্রধান কারণ এটাই : আমাদের স্বাস্থ্যগত অক্ষমতা। আমার ধারণা স্বাস্থ্যকে উন্নত করতে পারলে আমরা শক্তি ও সংঘবদ্ধতার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুঁজে পাব। আমাদের সংগঠনহীনতারও মূল কারণ এই স্বাস্থ্য না-থাকায়। কর্মোদ্দীপনা না-থাকায় আমাদের সংগঠন নেই।

সংগঠন থাকলেও তাতে শক্তি নেই। এই স্বাস্থ্যহীনতার কারণে আমরা উদ্যমহীন, কর্মবিমুখ, নেতিবাচক, অসহায়, পলায়নপর ও দুর্বল। এরই জন্যে শুধুমাত্র সংগঠনের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সব ক্ষেত্রেই আমরা সাধারণভাবে উত্থানরহিত। যে-দেশের রাস্তায় বের হলেই চোখে পড়ে শুধু রুগ্ণ আর স্বাস্থ্যহীন মানুষ; কালশিরা-পড়া, গাল-বসা সার-সার ফ্যাকাসে মুখের শোভাযাত্রা; সে-দেশ কী করে অন্যদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে? যে-মানুষ উঠে দাঁড়ায় না, আক্রমণ করে না, পরাজিত করে না, কেবল বসতে পেলে শুতে চায়, শুতে পেলে ঘুমোতে চায়, ঘুমোতে পেলে মরতে চায়; সে কী করে রাজ্য, সাম্রাজ্য, সম্রাজ্যবাদ গড়ে তুলবে? বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের এমন নিষ্ক্রিয়তা আর অক্ষমতা উৎরে কী করে গড়ে উঠবে জাতির সংগঠন? কী করে এই জাতি নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করবে?

কিছুক্ষণ আগে দৈনিক 'প্রথম আলো'তে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের একটা সাক্ষাৎকার পড়ছিলাম। আত্মোৎসর্গীত ও বাংলাদেশের অর্থনীতি-জগতের বর্ষীয়ান পথিকৃৎ অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে আমি আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে শ্রদ্ধা করি। তাঁর উক্তি চিরকাল প্রবুদ্ধ। সাক্ষাৎকারের এক জায়গায় তিনিও আমাদের এই নিস্পৃহতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কেন আমাদের রাজনীতিকরা দেশবাসীর ভাগ্য নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলতে পারছে তার কারণ বলতে গিয়ে তিনি বলেছন—তারা এটা পারছে আমরা, দেশের মানুষেরা, নিষ্ক্রিয় বলে, আমরা তাদের বাধা দিচ্ছি না বলে। তিনি বলেছেন : "আপনি হয়তো মনে করছেন আমি ভালো লোক, শিক্ষিত লোক, জ্ঞানী লোক, আমি জনগণের ভালো চাই। কিন্তু আপনি তো কিছু করছেন না, করার কথা ভাবছেন না; সমস্যাটা তো ওখানেই। আপনার নির্বাচিত প্রতিনিধি যা-কিছু খারাপ কাজ করছেন তা তিনি করতে পারছেন এইজন্যেই যে আপনি তাকে তা করতে দিচ্ছেন। আপনি তাকে শক্তভাবে বাধা দিচ্ছেন না। তাকে ভোট দিয়েই আপনি আপনার দায়িত্ব শেষ করে ফেলছেন। এই-যে সংসদ বর্জন চলছে, কোনো এলাকার ভোটাররা তাদের সাংসদকে তো জোরালোভাবে বলেনি আপনাকে আমরা আমাদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে সংসদে পাঠালাম, আপনি কেন সংসদে যাচ্ছেন না? সেখানে আমাদের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরছেন না কেন?"

কেবল রাজনীতিতে নয়, জীবনের প্রতিটি জায়গায় এই নির্জীবতার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছিল, কিন্তু সারা জাতি তা নিঃশব্দে মেনে নিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে কোথাও কোনো প্রতিবাদ ওঠেনি। আজ এতগুলো বছর ধরে ঢাকার বাতাস গ্যাস, সীসা আর কালো ধোঁয়ায় দুঃসহ আর শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে রয়েছে; বাতাস দূষণের দিক থেকে ঢাকা এখন পৃথিবীর দূষিততম নগরী। আমরা ঢাকার এক কোটি মানুষ কার্যত গ্যাস-চেম্বারে বাস করছি। বিশুদ্ধ বাতাসের জন্যে আমরা আকুল। আমরা নিশ্বাস

নিতে পারছি না। আমরা তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছি। সব আমরা বুঝি। সব টের পাই। এ নিয়ে মনে মনে ক্ষুব্ধও হই। কিন্তু এর প্রতিকারে কিছুই করি না। কেউ এগিয়ে আসে না। কোথাও কোনো সংঘবদ্ধ চেষ্টা দানা বাঁধে না।

স্বাস্থ্যহীনতা যেসব মৌলিক জায়গায় মানুষকে ব্যক্তিগত বা জাতিগতভাবে ক্ষতি করে এ তার একটি। এ আমাদের কর্মদক্ষতা, কর্মতৎপরতাকে ক্রমে ক্রমে নির্জীব করে আনে। এর কত প্রমাণই তো আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পাচ্ছি। কত সময় পত্রিকায় কত অসহনীয় খবর পড়ে সেগুলোর একটা দাঁতভাঙা জবাব দেবার উত্তেজনায় কত বিনিদ্র রজনী অস্থিরভাবে পদচারণা করে আমরা কাটিয়ে দিই। মনে মনে কত শাণিত শব্দ দিয়ে চিঠিগুলোর প্রতিটা বাক্যকে ইস্পাত-ফলার মতো ঝকঝকে করে তুলি। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে-চিঠি আমাদের লেখা হয়ে ওঠে না। এমনি কত অসমাপ্ত মৃত চিঠি বুকের ভেতর নিয়ে-যে আমরা একেকজন মানুষ কবরে যাই, কে তার হিসাব রাখে? এ কেবল চিঠির ব্যাপারে নয়, জীবনের প্রতিটি ব্যাপারেই।

সাফল্যের প্রধান শর্ত ক্ষিপ্রতা। আলেকজান্ডার, জুলিয়াস সিজারের মতো বীরেরা যেসব যুদ্ধে অলৌকিকভাবে জয়ী হয়েছেন সেগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই বিজয়গুলোর মূলে ছিল আক্রমণের ক্ষিপ্রতা। শত্রুপক্ষ প্রস্তুত হবার বা চিন্তা করার আগেই এমন আকস্মিক দ্রুততায় তাঁরা আক্রমণ করেছেন যে শত্রুর চোখ পুরোপুরি ধাঁধিয়ে গেছে, পরাজিত না হয়ে তাদের কোনো উপায় থাকেনি। ফ্র্যান্সিস বেকন লিখেছেন : বন্দুকের গুলি-যে আমাদের হত্যা করতে পারে তার কারণ আমরা বুঝে ওঠার আগেই তা আমাদের আঘাত হানতে পারে। কথায় আছে 'বিচার বিলম্বিত হওয়া মানে বিচার থেকে বঞ্চিত হওয়া'। স্বাস্থ্যহীনতা মানুষকে এই দেরিটুকু করিয়ে দেয়। ফলে কোনো প্রয়োজনেই সময়মতো জেগে ওঠা যায় না। যখন জাগি তখন আর সময় হাতে নেই। আমরা কেবলই সবকিছু ফেলে রাখি, সবকিছু পিছিয়ে দিতে থাকি। ফলে কাজের স্তূপ আমাদের ঢেকে ক্রমাগতভাবে উঁচু হয়ে উঠতে থাকে। আমরা পুরোপুরি লেজেগোবরে এক হয়ে যাই। দৌড় প্রতিযোগিতার শুরুর মুহূর্তে দেরি করে ফেললে যেমন ভালো দৌড়বীরকেও হেরে যেতে হয়, আমরাও তেমনি পরিণামে হেরে যাই।

৪

স্বাস্থ্যহীন মানুষের আর-একটা সমস্যা হল কোনোকিছু নিয়ে সে বেশিদিন লেগে থাকতে পারে না। তার শারীরিক দুর্বলতাই তাকে তা করতে দেয় না। ঈশপের 'কচ্ছপ আর খরগোশের দৌড় প্রতিযোগিতা'র গল্পে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া আছে। দৌড়-প্রতিযোগিতা হচ্ছে খরগোশ আর কচ্ছপের মধ্যে। খরগোশ ভালো দৌড়ায়,

কাজেই প্রথমেই সে কচ্ছপকে পেছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেল। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর সে পেছনে তাকিয়ে দেখল কচ্ছপ তার থেকে এত পেছনে পড়ে আছে যে কচ্ছপের জেতার কোনো আশাই আর নেই। সে তখন ভাবল, এই অবকাশে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। ভেবেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন সে দেখল একটু একটু করে এগিয়ে কচ্ছপ এর মধ্যে এতদূরই চলে গেছে যে যত জোরেই সে দৌড়াক, তাকে হারানো তার পক্ষে তখন একেবারেই অসম্ভব।

খরগোশ হেরেছিল ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে। কিন্তু আমার প্রশ্ন : সে ঘুমোতে গেল কেন? সে তো অসম্ভব ক্ষিপ্রগতির। আর সামান্য একটু দৌড়োলেই তো সে গন্তব্যে পৌঁছে আরামে ঘুমিয়ে নিতে পারত। বিজয় এবং ঘুম দুটোই উপভোগ করত। তাছাড়া সে তো জেতার জন্যেই দৌড়-প্রতিযোগিতায় নেমেছিল, মাঝপথে ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে নয়। তাহলে কেন ঘুমিয়ে পড়ল? এর কারণ খুঁজতে হলে তার শরীরটার দিকে আমাদের একটু তাকাতে হবে। আমরা দেখব, সে খুবই ক্ষিপ্রগতির বটে, কিন্তু তার শারীরিক গঠনটা ভারি নাজুক আর নরম—নেহাতই তুলতুলে একটা প্রাণী সে। এতই নরম যে সবরকম কষ্টকর কাজেরই সে প্রায় অনুপযুক্ত। ঐ প্রতিযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি, স্থৈর্য বা সহিষ্ণুতা কোনোটাই তার মধ্যে নেই। তাই স্বভাব-ক্ষিপ্রতায় বেশকিছুটা এগিয়ে গেলেও সে কিন্তু ততক্ষণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার চোখ অন্ধকার হয়ে এসেছে, সারা শরীর ভেঙে গভীর ঘুম নেমে এসেছে। ঘুম তখন তার অনিবার্য নিয়তি। ফলে সে তখন পেছনদিকে তাকিয়ে কচ্ছপের পিছিয়ে পড়াকে ঘুমের অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

কেন কচ্ছপ প্রতিযোগিতায় জিতল তাও তার শরীরের দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি। অসম্ভব মজবুত আর কর্মঠ প্রাণী সে, শত্রুর পক্ষে প্রায় অজেয়। যুদ্ধের মাঠের ট্যাঙ্কের মতো শক্ত দুর্ভেদ্য আচ্ছাদনে আবৃত তার শরীর। প্রাণিজগতের মধ্যে সে সবচেয়ে দীর্ঘায়ু, সবচেয়ে কষ্টসহিষ্ণু, সবচেয়ে ধৈর্যশীল—শারীরিক যোগ্যতায় খরগোশের চেয়ে অনেক ওপরে। ক্ষিপ্রগতি খরগোশের সঙ্গে দৌড়-প্রতিযোগিতায় নামার সাহস হবারই তো তার কথা নয়; তবু সে-যে নেমেছে তা হয়তো তার ভেতরকার দৃঢ় ও কষ্টসহিষ্ণু প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া এক ব্যাখ্যাহীন অন্ধ আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই; হয়তো তার মধ্যে এমন একটা অস্ফুট বিশ্বাস কাজ করেছে যে, নিজের মজবুত শরীর আর কর্মঠ প্রকৃতির সহায়তায় হয়তো সে এই প্রতিযোগিতায় জিতেও যেতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদি যাত্রার জন্যে এজন্যে সুস্বাস্থ্যের খুব প্রয়োজন। স্বাস্থ্যহীন মানুষেরা খরগোশের মতো প্রকৃতিগত উৎসাহে এক ঝটকায় কিছুদূর এগিয়ে গেলেও শিগগিরই তাদের চোখ অন্ধকার হয়ে সারা শরীর ভেঙে আসবে। তারা ঘুমিয়ে পড়বে। তরুণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমি এমন বেশকিছু ছেলেমেয়েকে

দেখতে পাই যারা হঠাৎ করে 'মহৎ-বৃহৎ' একটা-কিছু করার স্বপ্নে মরিয়া হয়ে ওঠে কিন্তু কিছুদিন কাজের পর তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ছেলেমেয়েদের বিশজনের উনিশজনই প্রায় এই দলের। এরা উৎসব-পূজারী। শিক্ষাঙ্গনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, পয়লা বৈশাখ, স্বাধীনতা দিবস—এমনি ধরনের উৎসবের দিবস পেলে এরা জীবন বাজি রেখে কাজ করে, পাহাড় পর্বত উল্টিয়ে সেগুলোকে সফল করে তোলে। কিন্তু অনুষ্ঠান শেষ হতেই সেই-যে ঘুম দেয়, ওঠে তিন মাস পর। এরা একটানা কোনোকিছুতে লেগে থাকতে পারে না। শক্তি কম বলে মানসিক উত্তেজনার বশে এক ঝটকায় পাগলের মতো কিছুক্ষণ কাজের ঝড় তুলে এরা শেষ হয়ে যায়। এইজন্য উৎসব এদের খুব প্রিয়। উৎসব অনেক দিন পরপর আসে, এক দুদিন থেকে চলে যায়। উৎসব মানুষের কাছে দাবি করে স্বল্পস্থায়ী কিন্তু পরিপূর্ণ আত্মদান। এটা, ঐ খরগোশের মতো চরিত্রের সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যায়। তাই প্রতিটা উৎসবে এদের এত আনাগোনা। কিন্তু যা দিয়ে মানুষের সত্যিকার সমৃদ্ধি তা তো উৎসব নয়; তা তো কর্মসূচি। কর্মসূচিতে এদের পাওয়া যায় না। কর্মসূচি চলে নিয়মিতভাবে, দীর্ঘকাল ধরে। দুঃসাধ্য ও সাধনা কঠিন এর পথ। মানবজীবনের উচ্চতর স্থিতি ও সমৃদ্ধি গড়ে ওঠে কর্মসূচির ভেতর দিয়ে।

উৎসব আর কর্মসূচি জিনিশ দুটি কী, একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই। প্রতি দিনের, প্রতি সপ্তাহের, প্রতি মাসের ভেতর দিয়ে বছরের শুরু থেকে বার্ষিক পরীক্ষা পর্যন্ত স্কুল কলেজের যে-পড়াশোনা, তাকে আমরা বলতে পারি কর্মসূচি। আপাতদৃষ্টিতে এ অত আনন্দজনক ও উত্তেজনামুখর ব্যাপার নয়। প্রতিমুহূর্তের শ্রম ও প্রয়াসের কঠিন সরণীতে এ বাঁধা। অনেক সময়েই বিরক্তিকর ও বিস্বাদ। কিন্তু একজন শিক্ষার্থীর অন্তর্জীবনের প্রকৃত বিকাশ ঘটে এর মধ্য দিয়েই। কিন্তু উৎসব হল বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীর দিনটি। সেদিন নানা বর্ণাঢ্য সাজে, রঙিন আল্পনায় স্কুল নববধূর মতো অনিন্দ্য হয়ে ওঠে, বাইরে থেকে সম্মানীয় অতিথি আসেন, আনন্দে-গানে-প্রাপ্তিতে-বৈভবে স্কুল মৌ মৌ করতে থাকে। এই দিনটি ঠিক সাধনার দিন নয়। কিন্তু এই দিনটি না-থাকলে সারা বছরের সাধনা পরিপূর্ণ হবে না। কিংবা ধরা যাক রোজা। এটি হল কর্মসূচি। ধর্মানুভূতির প্রকৃত উত্তরণ ঘটে এর মধ্যদিয়েই। ঈদ হল এই কর্মসূচির সমাপনী উৎসবের নাম। রোজা হল একটা নিয়মবাঁধা, কঠিন ও দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। ধর্মারোহণের এ এক দুরূহ কঠোর সোপান। ঈদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও সম্পূর্ণতা নির্ভর করে একে নিষ্ঠার সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে পালনের ওপর। যে-মানুষ সারাটা মাস ধরে গভীর নিষ্ঠা আর আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে প্রতিটি রোজা রেখেছে, তার জন্যে ঈদ এক অপার্থিব আনন্দ ও পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক উদ্ভাসের মুহূর্ত। যে ওটা করেনি তার জন্যে ঈদ একটা স্থূল ভোগের দিন মাত্র।

কাজেই উৎসবকে কর্মসূচি থেকে বিচ্ছিন্ন করে, শুধু একটি ভোগের দিন হিসেবে এর উদযাপনকে বড় করে তুললে জীবনের সম্পন্নতা থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হই। কিন্তু শারীরিক ও মানসিক শক্তির পুঁজি কম বলে উৎসব উদযাপনেই আমাদের সব শক্তি শেষ করে দিই; তিলতিল কষ্টের ভেতর দিয়ে কর্মসূচিকে সম্পূর্ণ করতে পারি না। এইজন্যে আমাদের দেশে এত উৎসব; বারো মাসে তিন তেরং ঊনচল্লিশ পার্বণ। উৎসবের ঢাকের গগনবিদারী আওয়াজ আর আনন্দনৃত্যের আড়ালে আমরা কর্মসূচির গুরুতর কর্তব্যকে কেবলই ফাঁকি দিয়ে চলি। বাংলাভাষার প্রতি সাংবাৎসরিক কর্তব্যে অবহেলা করি বলে সেই ক্ষতিকে পুষিয়ে দেবার জন্যে একুশে ফেব্রুয়ারি বর্ণাঢ্য ও আলোকোজ্জ্বল সব অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করতে হয়। কিন্তু তাতেও শেষ পর্যন্ত খুব-একটা লাভ হয় না। সব সাড়ম্বর উৎসবের মতোই উৎসবের বাতি নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষাপ্রীতির আয়ুও শেষ হয়ে যায়। আজও একুশে ফেব্রুয়ারির রাত তিনটায় পাড়ার সাহিত্যপ্রেমিকদের চড়াগলার ডাকাডাকি শুরু হয়ে যায়। শুনতে পাই উৎকণ্ঠিত কণ্ঠের উদ্বুদ্ধ আহ্বান : 'ভাইসব, আপনাদের ভেতর কি বাংলাভাষার প্রতি ভালোবাসা নাই? বাংলার সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা নাই? আপনারা এখনো ঘুমান? আপনারা উঠুন! শহীদ মিনারে ফুল দেবার মিছিলে যোগ দিন।' তাদের কণ্ঠে একই সঙ্গে বেদনা এবং ধমক। ডাকাডাকির ফলে চারপাশের ঘরবাড়ি থেকে সবাই এসে সমবেত হয়, শুরু হয় তিন-চার ঘণ্টার সুদীর্ঘ মিছিল; তারপর বহু মিছিলের পেছনে হেঁটে, দীর্ঘ পথ পেরিয়ে একসময় পাওয়া যায় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য দিতে পারার জ্যোতির্ময় মুহূর্ত।

ফেব্রুয়ারিতে শীত তখনো পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। কাজেই দীর্ঘপথ খালিপায়ে হেঁটে পুষ্পার্ঘ্য দিতে দিতেই 'বাংলাভাষার' অবস্থা মোটামুটি করুণ হয়ে ওঠে। পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে বাংলা একাডেমির বইমেলার ঘণ্টা-দুই হাঁটাহাঁটির পর 'বাংলাভাষা'র গলা আরও শুকিয়ে যায়। এরপর একটা-দুটোর দিকে অবসন্ন শরীরে ক্লান্ত নিঃশেষিত অবস্থায় ঘরে ফিরে 'বাংলাভাষা' সেই-যে বিছানায় শোয়, পরের বছর একুশে ফেব্রুয়ারির রাত তিনটার সময় আবার তা থেকে ওঠে।

উৎসবের মধ্যে সাংগঠনিকতার একটা অস্ফুট ও ঝাপসা চেহারা থাকলেও সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য উৎসব নয়। সংগঠনের লক্ষ্য সমষ্টিগত মানুষের কোনো কল্যাণপ্রদ ভবিতব্যকে চূড়ান্ত সার্থকতা দেওয়া। প্রতিটি মুহূর্তের ভেতর অতন্দ্রভাবে জেগে থেকে দীর্ঘদিনের শ্রমে ও সাধনায় তিলে তিলে একে ফলবান করে তোলা। এজন্যে দরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিশ্রম আর কষ্টসহিষ্ণুতার ক্ষমতা। স্বাস্থ্যের কারণে আমরা এই জায়গাটায় হেরে যাই। আমরা তোড়জোড় করে সবকিছু আরম্ভ করি ঠিকই, কিন্তু বেশিদিন তাকে ধরে রাখতে পারি না।

স্বাস্থ্যহীনতা-যে মানুষের জাগতিক উদ্যম এবং জগৎ-আক্রমণের শক্তিকেই কেবল নষ্ট করে তাই নয়, মানুষের মানসিক ভারসাম্যকেও দুর্বল করে আনে। স্বাস্থ্যহীন মানুষ কোনোকিছুতেই সুস্থিত হতে পারে না। সুস্থির ভারসাম্যময় ও পরিণত মানুষের মতো আচরণ এজন্যে তার ক্ষমতার বাইরে থাকে; সবকিছুতেই একটা অস্থিরতা ও অপরিণতির অনুভূতির তাকে অস্বস্ত করে রাখে। সবকিছুতেই সে চরমভাবাপন্ন, সবতাতেই অতিরিক্ততা, বাচালতা আর অপরিণতি। এদেশের বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, শিল্পী, লেখক থেকে শুরু করে রাস্তার রিকশাওয়ালা—সবার মধ্যে যে তীব্র মানসিক অসহিষ্ণুতা দেখা যায় তার দিকে তাকিয়ে নিশ্চয়ই আপনারা আমার কথায় সায় দেবেন। কোনো বিষয়ে বিতর্ক করতে গিয়ে দুজন বুদ্ধিজীবী সেই বিতর্ককে ব্যক্তিগত শত্রুতার পর্যায়ে নিয়ে যাননি, এমন উদাহরণ খুব কমই আছে।

বাঙালির সৌজন্যকে যেন পাকিস্তানিরা দুর্বলতা বলে ভুল না করে সে-কথা বোঝাতে গিয়ে পাকিস্তানিদের উদ্দেশে শেখ মুজিবুর রহমান একবার বলেছিলেন: বাঙালি যেমন কোমল হতে জানে তেমনি জানে কঠিন হতে। বর্ষার বৃষ্টিভেজা মাটির মতো সে যেমন নরম, বৈশাখের তপ্ত কঠিন ভয়ংকর মাটির মতো সে আবার তেমনি কঠিন। শেখ মুজিব ঠিকই বুঝেছিলেন, এই আমাদের চিরকালীন বাঙালি। সে সবসময়েই চরমপন্থী। সবসময়েই অযৌক্তিক, অতিশয়োক্তিময় ও একরৈখিক। জীবনের সোনালি মধ্যপথকে সে প্রায় কখনোই খুঁজে পায় না। জীবনের উত্থান-পতন এই দুটোকে দুই হাতে অবিচলভাবে ধারণ করে সমুন্নত ও উত্তুঙ্গ মর্যাদায় দাঁড়িয়ে থাকতে সে পারে না। ভয় পেলে সে যেমন কাপুরুষের মতো দৌড়ায়, ভালোবাসলে তেমনি নিবিড় আদরে গলে গিয়ে নেতিয়ে এলিয়ে একাকার হয়ে পড়ে, ক্ষিপ্ত হলে তেমনি প্রচণ্ড রোষে হয়ে পড়ে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য। ইসলামধর্মে বারবার বলা হয়েছে এই সোনালি মধ্যপন্থার কথা। বলা আছে : 'সীমানা লঙ্ঘনকারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন না।' বৌদ্ধধর্মেও তাই। কিন্তু আমরা অনেকেই গভীর মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সবসময় ঐ সীমা লঙ্ঘন করে চলি।

এডমন্ড বার্ক বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে বহু হিংস্র বা ভয়ঙ্কর প্রাণী রয়েছে কিন্তু খেপে-ওঠা মেষের মতো হিংস্র আর কেউ নয়।' মেষ নিতান্তই নিরীহ আর অসহায়। কিন্তু হিংস্র হলে সে ভয়ঙ্কর। খেপে গিয়ে যখন তারা লড়াই শুরু করে তখন তারা পরস্পরের শিং ভেঙে ফেলে, মাথা ফাটিয়ে রক্তাক্ত করে ঘিলু বের করে দেয়; তাও রণে ভঙ্গ দেয় না। এই শক্তির সঙ্গে আমাদের একটা জায়গায় মিল আছে। আমাদের দেশেও থেকে-থেকেই বিপ্লব-অভ্যুত্থানের ঢেউ দেখা যায়। বাঙালিরা তখন এক অসাধারণ শক্তিতে জেগে ওঠে। এ জাতিকে তখন যেন চেনাই যায় না। সে-শক্তির প্রচণ্ডতা দেখলে আতঙ্ক জাগে। কিন্তু মনে

রাখতে হবে এমন ভয়ঙ্কর শক্তি কিন্তু দুর্বল মানুষের শক্তি। পরাক্রান্ত মানুষের শক্তি এমন সৃষ্টি ছাড়া নয়। দীর্ঘদিন লাঞ্ছিত, নিষ্পেষিত হতে হতে একসময় মেষের মতো সব হারিয়ে আমরা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠি। এইজন্য আমাদের দেশে পনেরো-বিশ বছর পরে পরে একবার করে বিপ্লব হয়, অভ্যুত্থান হয়। এ অভ্যুত্থানকে শক্তির প্রকাশ ভাবা ঠিক নয়। এ হল আমাদের নিজেদের পরিত্রাণহীন অসহায়তার বিরুদ্ধে নিজেদেরই মরিয়া প্রতিরোধ। প্রতিদিনের বিপ্লব প্রতিদিন শেষ করতে পারি না বলে পনেরো বছরে একবার বিপ্লব করে বিপ্লবের বকেয়া পুষিয়ে নিতে চাই। পনেরো বছর ধরে আমরা শুধু সহ্যই করি। প্রতিবাদহীন, নীরব, মূক—শুধু মেনেই যাই, সয়েই যাই, নিষ্পেষিতই হয়ে যাই আর আত্মসমর্পণ করি। কিন্তু যখন অবস্থা একেবারে অসম্ভব হয়ে ওঠে, দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, তখন মরিয়া হয়ে পাল্টা আক্রমণ করি। দিগ্বিদিকশূন্যভাবে আক্রমণ করি। উভয় সত্তাই অস্বাভাবিক। যখন আমরা সহ্য করি তখনও আমরা অমানুষিক, যখন আক্রমণ করি তখনও তাই।

সুস্থ মানুষের শরীরে একটা সুস্থ মন বাস করে। আমাদের তেমন নয়। শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেলে আমরা প্রথমে তার হাত-পা দড়ি দিয়ে ভালো করে বাঁধি, তারপর ভোঁতা দা দিয়ে প্রথমে তার কান কাটি, তারপর এক এক করে তার হাত-পা-নাক-ঠোঁট কেটে বত্রিশ টুকরো করে তাকে ছালায় ভরে নদীতে ফেলে দিই। সামান্য কারণে মানুষের চোখ উপড়ে ফেলি, পায়ের রগ কাটি। সুস্থ মানুষেরা এমন নয়। তাদের আচরণে একধরনের ভারসাম্য ও স্থিরতা থাকে। সহনশীলতার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যেমন মাত্রাজ্ঞান থাকে, তেমনি থাকে হিংস্রতার ক্ষেত্রেও।

সুস্থ শক্তিমান এবং বলিষ্ঠ মানুষ হিংস্রতার রাস টেনে ধরতে পারে, শত্রুকে ক্ষমা করতে পারে। আমরা বলে থাকি : অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এই তিতিক্ষা শব্দটির মানে কি? তিতিক্ষা মানে ক্ষমা। উন্নততর বিজয়ের জন্যে এই ক্ষমা প্রয়োজন। যে রাবণ রামের ব্যক্তিগত জীবনকে ছারখার করে দিয়েছিল, সেই রাবণকে হত্যার পর রাম বিভীষণকে কী বলেছিলেন আসুন আমরা শুনি। রাম বলেছিলেন : 'বিভীষণ, তোমরা এখন রাবণের যথাযোগ্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন কর। ইনি সত্যিসত্যি একজন মহান বীর ছিলেন। প্রয়োজনে আমরা যুদ্ধ করেছি। আজ সে প্রয়োজন শেষ। এখন তিনি যেমন তোমার ভাই, তেমনি আমারও ভাই।' আমরা কি এই উদারতা দেখাতে পারি! আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আমাদের জাতীয় দল একটা সামান্য ম্যাচ জিতলে আমাদের সারাজাতি খুশিতে আনন্দে যেভাবে উন্মত্ত, বেসামাল ও হিংস্র হয়ে পড়ে বা জাতীয় নির্বাচনে জিতে যেভাবে প্রতিপক্ষের ওপর নিষ্ঠুর প্রতিশোধে মত্ত হয় তা থেকে আমাদের অস্থিতিশীল ও অপরিণত মনমানসিকতার পরিচয় মেলে।

জাতীয় স্বাস্থ্যহীনতা আমাদের চিন্তাশক্তি আর ভারসাম্যকে অনেকখানিই পঙ্গু করে দিয়েছে। সুস্থিত চিন্তার অভাবে আমরা সংগঠনকে সুসংহত করতে পারি না। সব কিছুতেই দ্রুত দৌড়াই আর উপস্থিত লাভ চাইতে থাকি। তাই সংগঠন অসহায় হয়ে পড়ে। সংগঠনের বিমূর্ততাকে আমরা বুঝতে পারি না। ব্যক্তির সঙ্গে সংগঠনের পার্থক্য বুঝি না। প্রায়ই সংগঠনকে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে ভুল করি। সংগঠনের জন্যে যে-আত্মোৎসর্গ করি তাকে সংগঠনের জন্যে আমাদের ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বলে ধরে নিই। কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এলে দলের কর্মীরা, দীর্ঘদিনের দুঃখ-কষ্টের খেসারত হিসাবে জনগণের সম্পদকে-যে কমবেশি লুটতরাজ করে খাবে, একে সব দলই তাদের বৈধ অধিকার বলে ধরে নেয়।

মানসিক ভারসাম্যের অভাব চিন্তাশীলতার জায়গায় আমাদের বড় ধরনের ক্ষতি করে দেয়। এজন্যেই আমাদের জাতির ভেতর এত কবি, লেখক, শিল্পী, গায়ক, নৃত্যশিল্পী; কিন্তু একজনও দার্শনিক নেই। এদেশের দার্শনিকেরাও আবেগ উদ্বেলিত, কবি ও ভাবালু। বলিষ্ঠ জীবনবোধ ও উজ্জ্বল হৃদয়াবেগের জায়গায় একধরনের অস্থির তরল উত্তেজনাকে আমরা আমাদের ঈশ্বর বানিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জীবনের এই দুর্বলতার দিকটি বারে বারে তুলে ধরেছেন। উত্তেজনাকে বড় করে তোলার বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। লিখেছেন : 'উত্তেজনা শক্তি নহে, দুর্বলতা।...উত্তেজিত মুহূর্তে আমরা সবচাইতে শক্তিহীন।' উত্তেজিত মুহূর্তে মানুষ কেন শক্তিহীন তা বোঝা কঠিন নয়। এই সময় বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। চিন্তাশক্তি নিয়ন্ত্রণহীন ও বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। থাকে কেবল বাচালতা, তারল্য আর অপরিণতি। কিন্তু চিরকালের মতো আজও আমরা এই উত্তেজনাকেই আবেগ বলে সম্মান জানিয়ে চলেছি এবং উত্তেজিত উচ্ছ্বসিত হওয়াকেই শক্তিশালী হওয়া ভেবে আত্মপ্রসাদ পেয়ে চলেছি।

৬

আমার গভীর বিশ্বাস আমাদের জাতিগত নিষ্ক্রিয়তা আর অবসন্নতার মূলে রয়েছে আমাদের বেদনাদায়ক স্বাস্থ্যহীনতা। আমরা কি বুঝি না কেন আমরা খেলাধুলায় অন্য জাতিদের তুলনায় পেছনে? কেন বাংলাদেশ ফুটবল দল বিদেশে যায় শুধু কত গোল খেয়ে দেশে ফেরা যায় তার বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করার জন্যে? কেন আমাদের ক্রীড়াবিদরা অলিম্পিকে যোগ দিতে যায় প্রাথমিক নির্বাচনীতে সন্দেহাতীতভাবে সর্বশেষ হবে এটা পুরোপুরি জেনেবুঝেই? কেন আমাদের ক্রিকেট দল বিদেশে খেলতে যায় একের পর এক জাতীয় দুঃসংবাদে সবাইকে ক্রমাগত বিমর্ষ করে দেবার জন্যে? হতে পারে আমরা গরিব, আমাদের খেলোয়াড়দের খাদ্যপুষ্টি নেই, তাই তারা পেরে ওঠে না। কিন্তু ইথিওপিয়ার

মতো বহু গরিবদেশও তো বহু জায়গায় বহুরকম সাফল্য দেখায়! এটা কেন সম্ভব হয়? কেবল দারিদ্র্যকে অজুহাত করে কি আমরা পার পাব? কেন উচ্চাঙ্গসংগীতে আমরা পরাক্রান্ত হয়ে উঠতে পারিনি, প্রায় তিনশ বছর একটানা চর্চার পরেও? কেন এর বৈভবসম্পন্ন ও রাজকীয় কারুকাজগুলো আমাদের হাতে পড়ে কেবলই 'সহজিয়া' হয়ে উঠতে চায়? কেন এমন অকারণ অবারণ এলিয়ে পড়ার দিকে আমাদের পক্ষপাত? কেন আমাদের অনেক গানই গলির শেষমাথার দাঁড়িয়ে থাকা অসহায় প্রাণীর করুণ কান্নার মতো? অথচ কে না জানে যে এই ধরনের কাজে সাফল্যের জন্যে সম্পন্ন স্বাস্থ্য প্রায় অনিবার্যভাবেই জরুরি।

এমন কোন্ জাতি আছে যাদের ভেতর যূথবদ্ধ সামাজিক নাচ নেই? উৎসবে পার্বণ্যে যারা সমবেতভাবে নেচে মনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-মত্ততা প্রকাশ করে না? এমন যে নারীসংস্পর্শ-বিবর্জিত অকর্ষিত আফগান তারাও তো উৎসবে-অনুষ্ঠানে মাঠের ওপর গোল হয়ে দাঁড়িয়ে, বাবড়িতে ঝাড়ি দিয়ে উদ্দাম নৃত্যে আকাশ কাঁপিয়ে তোলে। উন্নত জাতিগুলোর কথা বাদই দিলাম, কোল-ভিল-সাঁওতাল-মুণ্ডা এসব জাতিরও তো সামাজিক নাচ আছে। তাহলে আমাদের নেই কেন? মনের ভেতরটা আনন্দের অকথ্য বন্যতায় উদ্দাম হয়ে উঠলে সৌন্দর্যময় শারীরিক ভাষায় তাকে লীলায়িত করার আকুতি আমাদের জাগে না কেন? (কারো জাগলেও কেন ব্যঙ্গবিদ্রূপে তাকে এমনভাবে নিগৃহীত আর অপদস্থ করে দিতে থাকি যাতে তার মনও আমাদেরই মতো অসার আর নিরুৎসাহী হয়ে পড়ে।) নাকি খুশির উত্তেজনায় আমাদের মন কখনো-কখনো জ্বলে উঠলেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমাদের শরীর। শরীর জুড়ে চেপে-বসা সেই অবসাদ আর নিষ্ক্রিয়তা— যা উৎরে কিছুতেই শরীর সেই উত্তাল আনন্দের সঙ্গী হতে পারে না। যদি চায় সেও নিতান্তই কিছুক্ষণের জন্যে। তার পরেই সব চুপচাপ। আমাদের স্বাস্থ্যের যে সাধারণ মান তা দিয়ে আর যাই হোক নাচ হওয়া খুবই কঠিন। এ জন্যেই উচ্চাঙ্গ নৃত্য তো দূরের কথা আমাদের সামাজিক নাচও নেই। আমার ধারণা, যদি কোনো নাচের আসরে একনাগাড়ে আধঘণ্টাও নাচতে হয় তাহলে বুড়ো বা প্রৌঢ়রা তো বটেই, যুবকদেরও অনেকেই মেঝের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাবে। আমাদের শ্রমিক শস্তা, শ্রম শস্তা, তবু বিদেশি শ্রমিকের তুলনায় আমাদের শ্রমিক ব্যয়বহুল। এর কারণ যে-কাজে বিদেশি শ্রমিক লাগে একজন, আমাদের সেখানে লাগে তিনজন। কেন আমাদের শ্রমিকদের এই অক্ষমতা? স্বাস্থ্যের অপ্রতুলতা ছাড়া কী ব্যাখ্যা হতে পারে এর?

আমার মনে হয়, আমাদের জাতিগত ব্যর্থতাও নির্জীবতার সবচেয়ে বড় কারণ এইটিই।

৭

আমি যে বাঙালির আত্মপরতার কথা বলেছি, আমার ধারণা, এরও প্রধান কারণ স্বাস্থ্যহীনতা। নির্জীব স্বাস্থ্যের কারণে সে এমন নিষ্প্রাণ ও গৃহপালিত, এমন 'অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব'। এর জন্যেই তার জীবন হয়েছে সীমিত। কত ছোট্ট কুঠুরির ভেতর জীবনকে গুটিয়ে এনে কীভাবে টিকে থাকা যায় এই তার প্রাণপণ চেষ্টা। নিজের স্তিমিত অবসন্ন অস্তিত্বের ভেতর তার জীবন বেদনাদায়কভাবে অপচিত। তেলাপোকার মতো কোনোভাবে টিকে থাকতেই তার শক্তি শেষ হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্যহীনতার সেই অসীম অক্ষমতা এড়িয়ে সবার সঙ্গে মিলে বড় কিছু করা তার হয়ে ওঠে না। তার সব চেষ্টা তাই ওইটুকু বিবরের ভেতর জীবনকে সীমিত করে ফেলায়। কচ্ছপ যেমন সামান্যতম বিপদ দেখলে তার লম্বা মাথাটাকে খোলের ভেতর ঢুকিয়ে নিজেকে নিরাপদ করে সেও তেমনি নিজের সংকীর্ণ বিবরের ভেতর নিজে নিরাপত্তা নিরঙ্কুশ করে কোনমতে বেঁচে থাকতে চায়। বেশি মনে করে না ভয় পায়, সন্দেহের চোখে দেখে। এবং সে সবের বাড়াবাড়ি দেখলে তাদের তাকে ধ্বংস করার কথা চিন্তা করে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আমি প্রতি শুক্রবারে একাদল শ্রেণীর ছাত্রদের একটা পাঠচক্রে ক্লাস নেই। তাতে এক থেকে দেড়শ ছেলেমেয়ে আসে। তাদের মধ্যে কতজনের ভেতর স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম ও কর্মক্ষমতা রয়েছে তা পরীক্ষা করার জন্যে আমি মাঝে মাঝেই একটা অভিনয় করি। হঠাৎ করে বলে উঠি আমার একটু ঠাণ্ডা লাগছে, তোমরা কেউ সুইচবোর্ডে গিয়ে আমার মাথার ওপরের ফ্যানটা বন্ধ করে দাও তো। সব সময় দেখেছি আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দুতিন জন ছাত্র বা ছাত্রী উঠে সুইচবোর্ড খুঁজতে ছুটে যায়। দুচার জন নড়েচড়ে বসলেও চেয়ার ছেড়ে ঠিক ওঠে না। অন্যরা উঠে গেছে দেখে নিজেদের ভারমুক্ত ভেবে বাকিরা যেমন বসেছিল, তেমনি করে থাকে। একেবারেই নড়ে না। ঘাড় ঘুরিয়ে শুধু দেখে যায় কারা কাজটা করছে। কে তাদের ত্রাতা। একশ পঁচিশ জনের মধ্যে এরা একশ বিশ জন। কেন এরা ওঠে না। আমার ধারণা ঐ কারণ একই স্বাস্থ্যহীনতা। শরীরে কুলিয়ে ওঠে না। মনে হয়তো চায়, কিন্তু নির্জীব স্বাস্থ্য তাদের উঠতে দেয় না। এইজন্যে সবাই মিলে এগিয়ে গিয়ে দুদ্দাড় করে কোনো কাজ করতে পারে না। সবাই নির্জীবভাবে যে যার আলাদা চেয়ারে বসে। নিজের ছোট্ট জায়গাটুকু মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। শারীরিক স্বাস্থ্যহীনতা তাদের নিজ নিজ আত্মপরতার ভেতর নির্জীব করে রাখে। তাই কোনো জরুরি প্রয়োজনে তারা দল ধরে জেগে ওঠে না। যারা এগিয়ে যায় ঘাড় ফিরিয়ে আড় চোখে তাদের দেখে, আর নিজেদের হীনমন্যতা ও পরচর্চার পূরীষে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতার কারণও এটি। আমাদের সাংগঠনিক ব্যর্থতার

পেছনেও আমার বিশ্বাস, রয়েছে এর অবদান। আমরা-যে যুগযুগান্ত ধরে আমাদের প্রয়োজনীয় ও শক্তিমান সংগঠনগুলোকে সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তুলতে পারিনি, যার ফলে চিরকালের দাসত্ব হয়েছে আমাদের বিধিলিপি; আমরা-যে দুর্বল, অক্ষম অসহায়, কিংবা স্নায়বিকভাবে অস্থিতিশীল তারও একটা বড় কারণ : স্বাস্থ্যহীনতা। স্বাস্থ্য নেই বলেই আমাদের কর্মক্ষমতা নেই; কর্মক্ষমতা নেই বলে উৎপাদন নেই; উৎপাদন নেই বলে বিত্ত নেই, সচ্ছলতা নেই, পুষ্টি নেই; এসব নেই বলেই আবার সেই স্বাস্থ্য নেই। এই হল দুর্ভেদ্য চক্র।

৮

শারীরিকভাবে নির্জীব বা অলসদের দুধরনের মানুষ হয়ে ওঠার দিকে প্রবণতা দেখা যায় : এক. নিন্দুক; দুই. ও দস্যু। কথাটা কিছুটা পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে। নির্জীব মানুষ নিন্দুক হতে পারে। যে মানুষ কোনো কাজ করে না, যার কোনো সাফল্য নেই, গৌরব নেই, পরনিন্দা না করে নিজের অস্তিত্বকে অন্যের কাছে সপ্রমাণ বা অনুভব করার আর কী উপায় তার? কিন্তু ডাকাত সে হয় কী করে? আপনারা জানেন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের একটা সাত খণ্ডের বিরাট বই আছে : নাম 'বাংলার ডাকাত'। ব্রিটিশ আমলে বাংলার পথে-প্রান্তরে কত বিচিত্ররকম ডাকাত ছিল তাদের গল্প। আমার প্রশ্ন যে জাতি এত স্বাস্থ্যহীন আর রুগ্ণ সে জাতিতে এত ডাকাত আসে কোথা থেকে? এর উত্তর আছে আমার কাছে। তবে আগে আমার প্রশ্ন : কেবল কি ব্রিটিশ যুগে? আজও কি এদেশের ডাকাতের সংখ্যা তারও চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি নয়? আমাদের গল্পের বইগুলোতে ডাকাতদের যে ছবি পাই সেখানে তাদের রামদা হাতে ঝাঁকড়া চুলওয়ালা ভয়ঙ্কর চেহারার শক্তিশালী মানুষ হিশেবেই আঁকা হয়। কিন্তু আসলেই সব ডাকাত কি ওরকম : 'হাতে লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কানে তাদের গোঁজা জবাব ফুল?' যে সব দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীর ছবি হরহামেশা আজকাল পত্রপত্রিকায় বেরোয় তাদের চেহারা কি তাই বলে? এদের অধিকাংশই তো জীর্নশীর্ণ চেহারার লোক। এরশাদ সিকদার কি কোনো দশাসই চেহারার লোক না কালা ফারুক না মুরগি মিলন?

তাদের যা দেখে আমরা শিউরে উঠি তা তাদের দৈহিক শক্তি নয়; তাহল তাদের নিষ্ঠুরতা বা নৃশংসতার ক্ষমতা। আসুন আমরা বুঝতে চেষ্টা করি কোন্ ধরনের লোকেরা জগতে ডাকাত হতে উৎসাহী হয়। মানুষকে উন্নতি করতে হলে বা জীবনের কোনো বিষয়ে ফল পেতে হলে তা করতে হয় কষ্ট, শ্রম, চেষ্টা আর সংগ্রামের পথে। আমার ধারণা ডাকাত তারাই যারা ঐ ফলটা চায় কিন্তু ফল পেতে হলে যেসব শ্রম বা সংগ্রাম করতে হয় সেগুলো না করে কোনো সংক্ষিপ্ত, সহজ, শ্রমহীন পথে রাতারাতি এই উন্নতি বা ফলটা চায়। এ থেকে আমার ধারণা

ডাকাত কোনো স্বাস্থ্যবান বা পরাক্রমশালী লোকের নাম নয় (এই লোকগুলো সাধারণত ভারসাম্যপূর্ণ খোশমেজাজের ভালো মানুষ হয়)। ডাকাত আসলে এক ধরনের অলস মানুষের নাম। সেই মানুষ যে বুদ্ধিমান, ক্ষিপ্র, নির্মম কিন্তু অলস। ডাকাত কে? ধরা যাক, একজন মানুষ সারাদিন প্রাণপণ কষ্ট করে পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করে রাত নটার সময় মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরছে আর আমি সারাদিন ঘুমিয়ে সন্ধ্যার পর লাঠি হাতে সেই লোকটার রাস্তার পাশে আম গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছি আর লোকটা সেই গাছের পাশ দিয়ে যাবার সময় পেছন থেকে খট করে তার মাথায় একটা বাড়ি দিয়ে তার রোজগারের টাকাগুলো হাতিয়ে নিচ্ছি। এখন এই যে আমি—এই ডাকাত লোকটি—এই আমি কে? আমি আসলে একজন নিষ্কর্মা মানুষ—যে চেষ্টা শ্রম বা সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ভাগ্য নির্মাণে অনিচ্ছুক বা অপারগ। যে আমি আমার ভাগ্য গড়তে চাই সবচেয়ে দ্রুত ও অনায়াস ভাগ্যের আচমকা পথ ধরে।

বাংলাদেশে ডাকাত বা ডাকাত মনোভাব সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা যে এত বেশি তার কারণ, আমার ধারণা অলস আয়েসি ও অক্ষম লোকের সংখ্যা এদেশে বেশি (যার একটি কারণ অন্তত স্বাস্থ্যহীনতা)। এদের কঠোর হাতে দমন করতে না পারলে বা এদের স্বাস্থ্যবান ও শারীরিকভাবে সক্রিয় করে তুলতে না পারলে এই বিপুল সংখ্যক দস্যুর হাত থেকে আমাদের রেহাই নেই। আমার এই মোটা দাগের ধারণায় সাধারণভাবে ভুল থাকতে পারে তবে ভাবনার ভিত্তিতে যে কিছু পরিমাণে সত্যি আছে তাতে আমার সন্দেহ নেই।

কেন আমাদের স্বাস্থ্য বা কর্মক্ষমতা নিচুমানের?

১

এবার দেখতে চেষ্টা করি কেন স্বাস্থ্য খারাপ আমাদের? কেন কর্মক্ষমতা বা পরিশ্রমের বেলায় আমরা অন্যান্য জাতি থেকে পিছিয়ে? সাধারণ চোখে তাকালেও বোঝা যায় : একজন গড়পড়তা বাঙালি একজন গড়পড়তা ইয়োরোপিয়ান, আফ্রিকান বা চৈনিকের চেয়ে কম স্বাস্থ্যবান ও কম পরিশ্রমী। কেন কম? সে কম আগ্রহী বলে? তা নয়! তাহলে কেন? তার পুষ্টি অন্যদের চেয়ে কম বলে? কিন্তু যদি এরা সবাই সমান পুষ্টিসম্পন্ন হয় বা স্বাস্থ্য ব্যাপারে সমান সচেতন হয় তবেই কি একজন গড়পড়তা বাঙালি একজন চৈনিক, ইয়োরোপীয় বা আফ্রিকানের সমান স্বাস্থ্যের বা সমান কর্মক্ষমতার অধিকারী হবে? আমার তা মনে হয় না। তখনো, আমার ধারণা, তাদের স্বাস্থ্য বা কর্মক্ষমতা গড়পড়তা বাঙালিটির চেয়ে বেশিই হবে। কেন হবে? আমার মনে হয়, এর অন্যতম কারণ : জাতিগত বৈশিষ্ট্য।

জন্মগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই একজন শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ বা মঙ্গোলীয় গড়ে একজন বাঙালির তুলনায় কিছুটা মজবুত স্বাস্থ্য নিয়ে পৃথিবীতে জন্মায়। অস্থির গঠনে বা পেশিশক্তিতে সে বাঙালির তুলনায় অনেকটাই শক্ত ও সমর্থ। তার অধিকতর কর্মক্ষমতার অন্যতম উৎস এটি। আমার সন্দেহ যে 'ভেদ্দা' জাতিগোষ্ঠী থেকে আমাদের উদ্ভব তা আমাদের শারীরিক যোগ্যতাকে হয়তো কিছুটা নিচে নামিয়ে এনে থাকবে। ভেদ্দাদের শারীরিক সামর্থ্য আর্য, কৃষ্ণাঙ্গ, বা মঙ্গোলীয়দের সমকক্ষ নয়। অবশ্যি পরবর্তীতে বাঙালির সঙ্গে প্রধানত আর্য ও মঙ্গোলীয়দের কমবেশি মিশ্রণ হয়ে বাঙালির গড় স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতাকে কিছু পরিমাণে উন্নত করেছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে আজও যেসব বাঙালির শরীর-গঠনে ও অবয়বে আর্য বা মঙ্গোলীয় প্রভাব স্পষ্ট তাদের মধ্যে উদ্যম ও কর্মতৎপরতা গড়ে কিছুটা বেশি। বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উদ্যম ও কর্মমুখরতা দেখা যায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে। এদের অবয়বে আর্যপ্রভাব খুবই স্পষ্ট। নৃতাত্ত্বিকভাবে এদের অনেকেই প্রায় আধা-আর্য।

মুসলমানদের মধ্যেও মোগল পাঠান তুর্কি রক্তের উত্তরাধিকারসম্পন্ন মানুষেরা তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি শক্তসমর্থ ও পরিশ্রমী। বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তে মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষদের মধ্যে কর্মতৎপরতার প্রবণতা সুস্পষ্ট। আমি কথাগুলো খুব-একটা বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে বলছি না। এটা আমার শাদা চোখের পর্যবেক্ষণ। এ-পর্যন্ত যত উদ্যমশীল মানুষের সংস্পর্শে আমি এসেছি তাদের গড় করে আমার এমনটাই মনে হয়েছে। বাঙালির স্বাস্থ্য ও কর্মতৎপরতার অনটন আমাকে ছেলেবেলা থেকে কষ্ট দিয়ে আসছে। ব্যাপারটাকে আমার কাছে বাঙালির উন্নতির একটা বড় অন্তরায় বলে মনে হয়েছে। এ সমস্যাকে কীভাবে সমাধান করা যায় তা নিয়ে বহুদিন আমি নানাভাবে চিন্তা করেছি। অনেক সময় হাস্যকরভাবেই মনে হয়েছে বাঙালিদের সঙ্গে যদি আরও বেশি করে আর্য মঙ্গোলীয় বা নিগ্রো রক্তের মিশ্রণ ঘটানো যেত তবে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়তো হত।

আপনাদের হয়তো কারো কারো মনে আছে যে পাকিস্তানি আমলের শেষ কিছু বছরে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৌহার্দ্য বাড়ানোর লক্ষ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি যুবক-যুবতীদের মধ্যে বিবাহপ্রবণতাকে উৎসাহিত করা হয়েছিল। নিয়ম করা হয়েছিল : কোনো পূর্ব পাকিস্তানি ও পশ্চিম পাকিস্তানি বিয়ে করলে তাদের দুজনের প্রত্যেককে আড়াইশ করে টাকা দেওয়া হবে। পদক্ষেপটার কথা শুনে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের সেই রেষারেষির দিনগুলোতেও আমি খুশি হয়ে উঠেছিলাম। এই খুশি পাকিস্তানের স্থায়িত্বের জন্যে নয়, (পাকিস্তান ভেঙে যাবার ভাবনাটা তখনো মানুষের মনে অতটা বদ্ধমূল হয়নি।) খুশি হয়েছিলাম এ-কথা ভেবে যে, ব্যাপারটা কিছুকাল চললে আমাদের এই স্বাস্থ্য-উদ্যমহীন নির্জীব নিরানন্দ দেশে অচিরেই এমন কিছু তাগড়া চেহারার যুবক-যুবতী দেখা দেবে যারা দেশের সামনে আশার প্রতীক হয়ে দাঁড়াবে। দ্বিতীয়বার এ-ধরনের আশায় আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিলাম যখন, আশির দশক থেকে, বাঙালিরা বিপুল সংখ্যায় বিভিন্ন দেশে ভাগ্যান্বেষণে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। কিন্তু আমার এ আশাও নিষ্ফল হয়েছে। দেখা গেছে অনেক বাঙালি বিদেশে ইয়োরোপীয় বা মঙ্গোলীয় মেয়েদের বিয়ে করছে ঠিকই, কিন্তু তাদের এদেশে আনতে পারেনি, আনতে পারলেও বেশিদিন রাখতে পারেনি, স্ত্রীর বাধ্যগত হয়ে তার দেশেই ফেরত গেছে বা প্রথম থেকেই রয়ে গেছে। (কিছু করার নেই, বাঙালি ছেলেদের পৌরুষ কোনোদিনই দিগ্বিজয়ী বলে খ্যাত নয়। এখনো অন্তর্গত রক্তধারায় আমরা মাতৃতান্ত্রিক, আমাদের গড়পড়তা নায়ক এখনো শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, প্রেমিকার অন্নে প্রতিপালিত হতে যার সংকোচ হয় না এবং বিপদগ্রস্ত প্রেমিকা বিদায় করে দিলে নিরুপায় অবস্থায় গভীর দার্শনিকতার সঙ্গে যার আত্মোপলব্ধি ঘটে : 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না তাহা দূরেও ঠেলিয়া দেয়।')

২

আমরা যখন ছোট, ব্রিটিশ আমল তখন এদেশ থেকে বিদায় নিচ্ছে। ব্রিটিশ সাহেবদের যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা এদেশের মানুষের চোখে তখনো বিস্ময়। লোকেরা বলত : 'সাহেবরা হাঁটে না, দৌড়ায়।' সত্যিই দৌড়াত এই সাহেবরা। এরা এসেছিল এক প্রচণ্ড শীতের দেশ থেকে। আজকের মতো ঘরদোর, বাড়ি-গাড়ি বা অফিসকক্ষ উষ্ণ আরামদায়ক করে রাখার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা তাদের তখনো ছিল না। ঘরে-বাইরে নিষ্ঠুর শীতের হাওয়া সারাক্ষণ লকলকে চাবুকের মতো তাদের ছিন্নভিন্ন করত। সেই অবস্থাটা গজেন্দ্রগমনের অনুকূল নয়, জীবন বাঁচানোর জন্য তাদের প্রায় দৌড়ের গতিতেই ছুটতে হত। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে এটা তাদের অভ্যাস হয়ে যেত। শীত না থাকলেও তারা ওভাবে হাঁটত, এদেশে এসেও তাই করত।

যেসব দেশের আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন, সেখানকার মানুষদের সারাক্ষণ বিরুদ্ধ-প্রকৃতির সঙ্গে নির্মম সংগ্রাম করতে হয়। প্রকৃতির এই সার্বক্ষণিক বৈরিতার কারণে তাদের মনোভঙ্গি হয়ে ওঠে সংগ্রামী ও কঠোর, শরীর হয় কষ্টসহিষ্ণু এবং উদয়াস্ত যুদ্ধের উপযোগী ও তৎপর। প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধাবস্থায় থাকার কারণে তাদের ভেতরকার কর্মক্ষমতা বেড়ে যেতে থাকে। এসব দেশের মানুষ স্বভাবতই কর্মোদ্যমী ও পরিশ্রমী। আমাদের দেশের আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন নয়, নাতিশীতোষ্ণ। কেবল নাতিশীতোষ্ণ নয়, এমনি নাতিশীতোষ্ণ যে একটিমাত্র গড়পড়তা জামা গায়ে চাপিয়েও এদেশে একজন মানুষ প্রায় সারাবছর কাটিয়ে দিতে পারে। এখানে জমি উর্বর ও সজীব। কোনোমতে বীজ ছিটিয়ে দিতে পারলেই ফসল পাবার নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। এখানে পানি পর্যাপ্ত ও সুলভ। প্রকৃতির দান অফুরন্ত। এসব কারণে জীবনসংগ্রাম এদেশে কখনোই তীব্র হয়নি। কেবল বাংলাদেশে নয়, সারা উপমহাদেশেই এটা হয়নি। জীবন-সংঘাতহীন ও নিস্তরঙ্গ পরিবেশে বেঁচে থাকে বলে এখানকার মানুষের কর্মোদ্দীপনা খুব একটা বাড়তে পারেনি। তাই তাদের ঝোঁক ইহকালের চাইতে পরকালের দিকে পড়েছে বেশি। তাই ধর্ম এখানে যতটা গুরুত্ব পেয়েছে; দর্শন, বিজ্ঞান বা বৈষয়িক দ্বন্দ্বসংঘাতসংকুল বিষয়গুলো ততটা মূল্য পায়নি।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশের ওপর প্রকৃতির দান ছিল সবচেয়ে অকৃপণ। তাই আমাদের জীবনসংগ্রাম ছিল সবচেয়ে কম। আমাদের স্বভাবে এর ছায়া পড়েছে। আমরা হয়ে পড়েছি আয়েশি, আরামপ্রিয়। আমাদের দেশ হয়ে পড়েছে হবুচন্দ্র রাজা আর 'পি পু ফি শু'দের দেশ।

বছর দশ-বারো আগে আমি একবার অক্সফোর্ডে উইলিয়ম রাদিচির বাসায় অতিথি হয়েছিলাম। সেদিন অক্সেফোর্ডের বিভিন্ন ভবন হেঁটে দেখানোর সময়, রাদিচি আমাকে অভিনয় করে দেখিয়েছিলেন প্রাচ্যদেশের মানুষ হাঁটে কেমন করে'

ওরিয়েন্টাল ওয়াক কেমন? এদের জীবন্মৃতভাবে হাঁটার দৃশ্য এমন চমৎকার ও সুনিপুণ অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি জীবন্ত করে তুলেছিলেন যে তা আজও আমার চোখে স্পষ্টভাবে লেগে আছে। আমি প্রাচ্যের বেশকিছু জায়গায় গেছি। কিন্তু কোথাও মানুষকে এমন প্রাণহীনভাবে হাঁটতে দেখিনি। আমার ধারণা রাদিচি আসলে প্রাচ্যদেশের নয়, বাঙালির হাঁটার ভঙ্গিই অভিনয় করে দেখিয়েছিলেন আমাকে (কারণ প্রাচ্য জাতিগুলোর মধ্যে বাঙালিদেরই তিনি সবচেয়ে কাছে থেকে দেখেছেন)। এটা বলছি এজন্যে যে প্রাচ্যের দেশগুলোতে নয়; লাহোর, মুম্বাই, দিল্লি, সিঙ্গাপুর, হংকং, ব্যাঙ্ককে নয়; আমার দেশে আমার চারপাশেই মানুষকে আমি সাধারণত ওভাবে সারাক্ষণ হাঁটতে দেখি। আমাদের স্বাস্থ্যগত দুর্বলতার সঙ্গে আমাদের জীবনের সংগ্রামহীনতা যোগ হয়ে আমাদের এমন চলৎশক্তিহীন আর নিষ্প্রাণ করে দিয়েছে।

মোদ্দাকথা, মৃদু ও বন্ধুভাবাপন্ন আবহাওয়ার কারণেও আমাদের স্বাস্থ্যের উদ্দীপনা ও কাজের স্পৃহা হয়ত কিছু পরিমাণে নিস্পৃহ।

৩

আরও যে-ব্যাপারটি আমাদের স্বাস্থ্যের সক্রিয়তাকে কিছুটা নির্জীব করেছে, তা মনে হয়, আমাদের দেশের ভ্যাপসা গরম ও দুঃসহ আবহাওয়া। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শীতকালে এবং গরমকালে আমাদের উৎসাহ বা কর্মতৎপরতা সমান নয়। শীতকালে আমরা অনেক বেশি প্রাণবন্ত আর ঝরঝরে। আমাদের কর্মশক্তি তখন অনেক সপ্রতিভ ও চৌকস। আমাদের হাঁটা তখন প্রাচ্যের হাঁটা থেকে পাশ্চাত্যের হাঁটা হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু সে নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে মার্চ বা এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত। কিন্তু এর পরের দীর্ঘ সাত মাস ধরে একটানা আবার সেই দুর্বিষহ, ভারী আর গুমোট আবহাওয়া—সেই গরম, ঘাম আর নিশ্বাস চেপে-ধরা ভারাক্রান্ত আর্দ্রতা। আর্দ্র জলবায়ুতে মানুষের কর্মক্ষমতা-যে কমে যায় এবং শুকনো জলবায়ুতে-যে বাড়ে তা তো আমরা গরমের দিনে এ.সি. রুমের বাইরের আর ভেতরকার অবস্থা দেখলেও বুঝতে পারি।

যেসব দেশের জলবায়ু ভেজা বা ভ্যাপসা সেসব দেশে মানুষের শরীরের ঘাম ও ডিহাইড্রেশন বেশি, বাতাস তুলনামূলকভাবে ভারী বলে মানুষের কর্মশক্তি কিছুটা ভারাক্রান্ত এবং শরীর বেশকিছু বাড়তি অসুখের শিকার। দীর্ঘ সাতমাস ধরে আমাদের দেশের গুমোট ও গরম আবহাওয়া আমাদের কর্মশক্তিকে অনেকটাই নির্জীব করে আনে। শীতকালে সেই কর্মশক্তিতে কিছুটা চাঞ্চল্যের রঙ লাগলেও সেই শ্বাসরুদ্ধকর গুমোট আবহাওয়া কিছুদিনের মধ্যে ফিরে এসে তাকে আবার চলৎশক্তিহীন করে ফেলে। আমাদের কর্মতৎপরতা তাই কখনোই প্রায় পরিপূর্ণ শক্তিতে কার্যকর হয়ে উঠতে পারে না।

স্বাস্থ্যহীনতা ও অন্যান্য প্রতিকূলতাগুলো আমাদের অসুবিধায় ফেললেও এই সবগুলো প্রতিবন্ধকতাকেই কিন্তু জয় করা সম্ভব। কিন্তু এই দুটি প্রধান দুর্দৈবের ব্যাপারে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আমাদের আদৌ কোনো সচেতনতা আছে বলে মনে হয় না। পৃথিবীর মধ্যে প্রায় সবচেয়ে খারাপ স্বাস্থ্য আমাদের, অথচ এ-ব্যাপারে আমরা পুরোপুরি নির্বিকার। স্বাস্থ্যব্যাপারে উৎসাহী বা সচেতন মানুষ আমাদের জাতির ভেতর নেই তা নয়, তবে তারা স্থূলতার উপাসক হিসেবেই সবার উপহাস্য। আমাদের স্বাস্থ্যচর্চা ও স্বাস্থ্যসচেতনতা শুরু হয় বার্ধক্যে, ডায়বেটিস ধরার পর। সবকিছুর মতো স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও আমরা পুরোপুরি নিয়তিবাদী। যেন অদৃষ্ট যা করবে তাই হবে। স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ নেবার জন্যেও যেটুকু স্বাস্থ্য দরকার সেটুকুও না-থাকায় স্বাস্থ্যব্যাপারে আমাদের উৎসাহ আমাদের অস্বাস্থ্যের মতোই নির্জীব।

না, স্বাস্থ্য বলতে আমি হেভিওয়েট বক্সার বা জাপানের সুমো পালোয়ান হবার কথা বলছি না। আমি বলছি মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যটুকুর কথা। পরিপার্শ্বের সঙ্গে সংগ্রামে টিকে থাকা বা তার ওপর জয়ী হওয়ার জন্যে যেটুকু স্বাস্থ্য দরকার তার কথা। একবার একটা উপজেলা শহরের কবিতাপাঠের এক অনুষ্ঠানে একটি খুবই মেধাবী মেয়েকে আমার চোখে পড়েছিল। অনুষ্ঠানে একটা অপূর্ব সুন্দর স্বরচিত কবিতা পড়ে শুনিয়েছিল মেয়েটি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে যেমন রোগা তেমনি স্বাস্থ্যহীন। অনুষ্ঠানের পর সে আমার সামনে অটোগ্রাফ খাতা এগিয়ে দিয়ে 'মহৎ বৃহৎ' কিছু লিখে দেবার জন্যে অনুরোধ করল। মেয়েটির জন্যে আমার মায়া লাগছিল। এত মেধা নিয়ে সে কী করবে যদি তার স্বাস্থ্য তাকে সহযোগিতা না করে। আমি তার খাতায় লিখে দিলাম : 'প্রতি সপ্তাহে একটা করে বই পড়া ও প্রতিদিনে দশ মিনিট করে ব্যায়াম।' আমার দ্বিতীয় কথাটা পড়ে সে মুখ টিপে হাসল। সে হাসিতে স্পষ্ট অবিশ্বাস আর উপহাস। আমি টের পেলাম তার ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমার সব উৎকণ্ঠা মাঠে মারা গেছে। স্বাস্থ্যহীনতার কারণেই আমরা স্বাস্থ্য ভালো করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণে এমন অক্ষম এবং তাচ্ছিল্যপরায়ণ। আমাদের গড়পড়তা মানুষের কাছে স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ একটা বিদ্রূপের ব্যাপার মাত্র। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কাছে তো এ মেধাহীনতারই অন্য নাম।

কিন্তু কী হত ঐ মেয়েটির যদি সে ঐ সামান্য কাজটুকু করত? দিনে দশ মিনিট করে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ বা জগিং বা স্কিপিং? দেখতে দেখতে তার রক্তশিরায় প্রাণের উদ্দামতা এসে যেত, শরীর সজীব হয়ে উঠত। সে হয়ে উঠত একজন আত্মপ্রত্যয়ী, আনন্দময় ও ইতিবাচক মানুষ এবং জীবনটা তার কাছে হয়ে উঠত অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষিত ও ভালোবাসার জিনিশ। সবচেয়ে বড় কথা, জীবনকে

আনন্দময়ভাবে উপভোগ করার এবং এর ওপর বিজয়পতাকা ওড়াবার মতো একটা সুষ্ঠু নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারী হত সে।

কেবল সাধারণ মানুষ নয়, আমাদের অসাধারণ মানুষেরাও আমাদের স্বাস্থ্যহীনতার ব্যাপারে কোনোকালেই খুব-একটা সচেতনতা দেখাননি—সেই স্বাস্থ্যহীনতার ব্যাপারে যা বাঙালির প্রায় প্রতিটি সমষ্টিগত উদ্যোগ এবং অর্জনকে ব্যর্থ করে রেখেছে এবং গড়পড়তা বাঙালিকে করে রেখেছে পুরুষকারহীন নিয়তির হাতের পুতুল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার এক জায়গায় যদিও বাঙালির জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন অন্ন, আলো, প্রাণ; কামনা করেছিলেন বল, স্বাস্থ্য, 'আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু' ও 'সাহস বিস্তৃত বক্ষপট'; কিন্তু কী করে এই বক্ষপট বাঙালি অর্জন করবে তা নিয়ে মাথা ঘামাননি। বাঙালিদের মধ্যে স্বাস্থ্যব্যাপারে যিনি প্রথম সরাসরি কথা বলেছেন তিনি বিবেকানন্দ। বাঙালির স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যাপারটা তাকে এতটাই অস্বস্ত করে তুলেছিল যে, তিনি স্বাস্থ্যকে ধর্মের প্রায় পূর্বশর্ত করে তুলেছিলেন। 'ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "হে আমার যুবক বন্ধুরা! তোমরা সবল হও। ... গীতা পড়ার চেয়ে ফুটবল খেললে তোমরা স্বর্গের আরো নিকটবর্তী হবে। আমাকে খুব সাহসের সঙ্গে এ কথাগুলো বলতে হচ্ছে।... তোমাদের শরীর একটু শক্ত হলে তোমরা গীতা আরো ভালো বুঝবে।" তাঁর প্রেরণা থেকেই অনুশীলন সংঘ জাতীয় শক্তি ও স্বাস্থ্যের জাগরণকে অন্যতম প্রধান ব্রত বলে গ্রহণ করে এবং জাতীয় মুক্তির সন্ধানে সশস্ত্র প্রতিরোধের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু এর পর এ-ব্যাপারে সবাই মোটামুটি প্রায় নীরব এবং গুরুসদয় দত্ত জাতীয় দুয়েকজনের বিক্ষিপ্ত প্রয়াস ছাড়া তেমন আর কিছুই চোখে পড়ে না।

আমি আজও বুঝি না বাঙালির জন্যে কোন্‌টা আজ বেশি জরুরি : জ্ঞানান্দোলন না স্বাস্থ্য-আন্দোলন। জ্ঞানান্দোলন তো আমাদের জাতির ভেতর কমবেশি হয়েছে। কিন্তু যে-কারণে আমরা সেই জ্ঞানান্দোলনের ফসলকে ঘরে তুলতে পারিনি তা হল স্বাস্থ্যহীনতা। স্বাস্থ্যের এই অনটন থেকে আমাদের জাতিকে যেমন করেই হোক মুক্তি দিতে হবে। এই সমস্যাটিকে আজ আমাদের শক্ত দাঁতে কামড়ে ধরতে হবে। না হলে কী করে একটা সম্পন্ন সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখব? কী করে গড়ে উঠবে সেইসব সুস্থ, সমর্থ, সাহসবিস্তৃত বক্ষপটসম্পন্ন ইতিবাচক বলিষ্ঠ মানুষ—যারা লক্ষ লক্ষ সুঠাম সংগঠন গড়ে তোলার ভেতর দিয়ে আগামীদিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশকে গড়ে তুলবে। আমার ধারণা, আমাদের জাতির জ্ঞানের মতো আজ একইরকম জোর দেওয়া উচিত স্বাস্থ্যের ওপরে। সামরিক বাজেট থেকে টাকা কেটে এনে তা ব্যয় করা উচিত জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে।

আমাদের দেশে স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয় নামে একটা মন্ত্রণালয় আছে। কিন্তু সেই মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে খুব-একটা ভূমিকা রাখে বলে মনে হয় না। তার মূল কাজ হাসপাতাল, রুগী, নার্স, ডাক্তার, ওষুধ, পথ্য এসব নিয়ে। যে মন্ত্রণালয়

এসব নিয়ে কারবার করে তার নাম কেন স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয় হয় বুঝতে পারি না। তার নাম তো হওয়া উচিত রোগ-মন্ত্রণালয়। যদি ভদ্রতা করে বলতে হয় তো বড়জোর বলা যায় আরোগ্য-মন্ত্রণালয়। না, ক্রীড়া মন্ত্রণালয় দিয়েও এ-কাজ হবে না। ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কাজ করে মন ও স্বাস্থ্যের আনন্দ-উদ্দীপনার জন্যে, জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে নয়। তারা যে ক্রীড়ার প্রসার-প্রচারের চেষ্টা করে সেই খেলা খেলে বাইশজনে, দেখে বাইশ হাজার জনে। এই বাইশ হাজার জনের স্বাস্থ্য কী করে ভালো হবে তার কোনো রূপরেখা তাদের নেই। তাছাড়া জাতির খুব অল্পসংখ্যক মানুষের কাছেই এই মন্ত্রণালয় তার সুযোগসুবিধাগুলো পৌঁছাতে পারে। আমাদের দরকার জাতীয় স্বাস্থ্যের সামগ্রিক উন্নতি। বাইশজন খেলোয়াড়ের কেবল নয় বাইশ হাজার দর্শকের খেলা।

আমাদের দরকার এমন একটা মন্ত্রণালয় যা দেশের প্রতিটি মানুষকে স্বাস্থ্যচর্চার উদ্যম, আনন্দ ও উৎফুল্লতার মধ্যে প্রজ্বলিত করে তুলতে পারবে। তার কাজ হবে দেশের প্রতিটি পাড়ায়, মহল্লায় স্বাস্থ্যপিপাসুদের হাজার হাজার উন্মুখ উৎসাহী দল গড়ে তোলা। তাদের ভেতর নিয়মিত প্রতিযোগিতার আয়োজন করে যাওয়া। প্রশ্ন উঠতে পারে : আমাদের মতো এমন জনসংখ্যাকবলিত দরিদ্র দেশে কী ধরনের খেলা বা স্বাস্থ্যচর্চার আয়োজন করা যেতে পারে? উত্তর হল : এমন সব খেলাকে জনপ্রিয় করে তোলা যেতে পারে যাতে ব্যয় কম, জায়গা লাগে কম কিন্তু অনেক মানুষ খেলাধুলার সেই অনাবিল আনন্দের মধ্যে জড়ো হতে পারে। যেমন টেবিল টেনিস। প্রতিটা পাড়ায় কেবল নয়, ঘরে ঘরে এ খেলা চালু করে সারাদেশে তা ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং হাজার হাজার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সারা জাতিকে এই খেলায় উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এতে একটা বিপুলসংখ্যক মানুষকে স্বাস্থ্যচর্চার সজীব আনন্দের মধ্যে দিয়ে আসা সম্ভব।

এমনি আরও অনেক খেলার কথাই মনে করা যায়। টেলিভিশনের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে এ্যারোবিক্সের মতো আনন্দময় নৃত্যগীতমধুর শরীরী-অনুশীলনকে ঘরে ঘরে জনপ্রিয় করে তোলা যায়। এ খেলা নিয়েও দেশজুড়ে অসংখ্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা সম্ভব। স্কুলগুলোর বিভিন্ন ক্লাসের মধ্যে নিয়মিত প্রতিযোগিতার আয়োজন করে পিটি বা ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজকে প্রতিটি ছেলেমেয়ের জীবনের অংশ করে দেওয়া সম্ভব। এমনি আরও অনেক খেলার কথা ভাবা যেতে পারে যেগুলোর ভেতর দেশের ছেলেমেয়েদের উজ্জীবিত করে তুলে তাদের স্বাস্থ্য গড়পড়তাভাবে ভালো করা যায়।

আবারো বলি : জাতীয় স্বাস্থ্যের এই সামগ্রিক উন্নতি ঘটানোর লক্ষ্য দেশে কয়েক লক্ষ গামা পালোয়ান তৈরি করা নয়; এর লক্ষ্য প্রতিটা মানুষের ন্যূনতম কর্মতৎপর স্বাস্থ্যকে নিশ্চিত করা; তাকে এমন একটা সুষ্ঠু সবল কর্মক্ষমতার পর্যায়ে নিয়ে আসা যাতে সে আনন্দময়, উদ্যত ও যোগ্যতাসম্পন্নভাবে বেঁচে থাকতে পারে

এবং পরিপার্শ্বের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে। স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মিলিত চেষ্টা দিয়েও এটা সম্ভব নয়। যেসব দেশের মানুষের স্বাস্থ্যের একটা ন্যূনতম মান আছে সেসব দেশে এ দিয়ে চলতে পারে। আমাদের মানুষদের স্বাস্থ্যের মান আশঙ্কাজনকরকমে করুণ। এই বাড়তি সমস্যা মোকাবেলার জন্যে বাড়তি উদ্যোগ দরকার।

৫

বছর-পঁচিশেক আগে আমি প্রথম দেশের বাইরে যাই। আমার প্রথম গন্তব্য ছিল ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, সিডনি, মেলবোর্ন—এসব শহর। বইপত্র থেকে আমার জানা ছিল আমাদের দেশের মতোই থাইল্যান্ড, কুয়ালালামপুর, সিঙ্গাপুর—এসবও উন্নয়নশীল দেশ। কাজেই ধারণা ছিল দেশগুলোর অবস্থা হয়তো কিছুটা আমাদেরই মতো, হয়তো উনিশ-বিশ। কিন্তু প্লেন থেকে ব্যাঙ্ককে নেমে আমি বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। যে বিশাল রাস্তা ধরে আমার ট্যাক্সি ছুটে চলল, যে বিশাল বিশাল দালানকোঠা দুপাশে চোখে পড়ল তার অপরিমেয়তা আমাকে বিহ্বল করে দিল। আমি এতখানির জন্যে তৈরি ছিলাম না। মানুষের চেষ্টা, শ্রম আর উদ্যমের যে-অর্জনকে চোখের সামনে দেখলাম তা সত্যিই অভাবিত।

সিঙ্গাপুরে গিয়ে এই বিস্ময় আরও গভীর হল। (আমার এই বিস্ময় সর্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করেছিল আমেরিকায় ম্যানহাটান দেখার সময়।) এসবের পাশে ঢাকাকে রাখলে কী হতাশই না লাগে! কোথায় আমরা? কোন্ অতলান্ত পশ্চাৎপদতার সর্বনিম্ন অন্ধকারে! এর মানে এ নয় যে এই পশ্চাৎপদতাকে আমরা অতিক্রম করব না। বরং এই ব্যাপারটাই তো আজ আমাদের সবচেয়ে আগে করতে হবে। আজ এই পশ্চাদপদতাকে মোকাবেলা করার সবচেয়ে বড় উপায় : জাতীয় জীবনের প্রয়োজনীয় সংগঠনগুলো (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক) গড়ে তোলা ও সেই সংগঠনগুলোকে ফলপ্রসূ করার জন্যে নিজেদের শারীরিক ও মানসিকভাবে যোগ্য করে তোলা।

আমাদের সরকার-পদ্ধতির রূপরেখা

কোন্ ধরনের সংগঠন আমাদের জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে মিল খায় তা নিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে দুয়েকটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আমার ধারণা, সব দেশেরই সংগঠনগুলোর সাফল্য নির্ভর করে সে-দেশের জনসাধারণের প্রকৃতি ও মনোভঙ্গির সঙ্গে সেগুলো কতটা সঙ্গতিপূর্ণ হল তার ওপর। আমাদের দেশের সংগঠনগুলো আমেরিকার বা ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতিকেন্দ্রিক কাঠামোর মতো নয়; ব্রিটেনের সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোর ধাঁচের। আমাদের দেশের ছোটবড় প্রতিটি সাংস্কৃতিক বা সামাজিক সংগঠনের দিকে তাকালে আমরা কী দেখি? দেখি কার্যকরী সংসদে আছে বিরাটসংখ্যক সদস্য। সভাপতি একজন থাকে তো সহ-সভাপতি থাকে পাঁচজন। সাধারণ সম্পাদক একজন থাকে তো যুগ্ম-সম্পাদক তাকে দুই বা চারজন। এরপর সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, সাধারণ সাধারণ যুগ্ম সম্পাদক— এমনি কত হাজার লাখ যে আছে তার সীমা নেই। সংগঠনের মানুষের সংখ্যা এতবেশি হওয়ার অসুবিধা এই যে, কোনো একটি দায়িত্ব যে সত্যি সত্যি কার তা বুঝো ওঠা কঠিন হয়ে যায়। সেখানে 'পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি/ মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।' অবস্থাটা হয়ে পড়ে পুরোপুরি অরাজক। আমাদের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ বা আদর্শ যদি উন্নতমানের হত তাহলে এ কোনো সমস্যা করত না। আমরা যে-যার দায়িত্ব বুঝে নিয়ে তা পালনের জন্যে নিবেদিত থাকতাম। নাহলে মানুষের চোখে ছোট হয়ে যেতাম। ইংল্যান্ডে এ নিয়ে কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু আগেই বলেছি আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই কর্মোৎসাহহীন ও অবসাদগ্রস্ত। তারা পজিশন চায় কিন্তু পাওয়ার চায় না। তারা মেয়র হতে চায়, কিন্তু নগরের মানুষকে জঞ্জাল আর আবর্জনার হাত থেকে মুক্ত করার জন্যে ঝাঁপ দিতে নারাজ। তারা সংগঠনকে কিছুই দেয় না, এর জন্যে কিছুই করে না, কেবল এ থেকে পেতে চায়। যদি সত্যিই কিছু করে তবে তা একটাই—দ্বন্দ্ব আর কোন্দল। এই কোন্দলের ফলেই আমাদের সংগঠনগুলো ধীরে ধীরে শক্তিহীন ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এত মানুষের লোভ ও অযোগ্যতার

খেসারত দিতে গিয়ে, সংগঠনগুলোর পুরো স্বপ্ন ও আদর্শটাই মিথ্যা হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।' কথাটাকে অনেকে কবির বাউল মনের খেয়ালি কল্পনা হিসেবেই ধরে নেন, সাংগঠনিক অর্থে একে মূল্য দেন না। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমার ধারণা, গভীর ও বাস্তব উপলব্ধি থেকেই রবীন্দ্রনাথ কথাটা লিখেছিলেন। তিনি জানতেন, ব্যক্তির চলা মানেই সমষ্টির চলা। সমষ্টি তখনই চলতে শুরু করে যখন কোনো অদমিত ও অনুপ্রাণিত ব্যক্তি চলা শুরু করে। তাই ব্যক্তিই সংগঠনের আসল জন্মদাতা। একটি সংগঠন জন্ম নেবে কি নেবে না তা শেষপর্যন্ত নির্ভর করে একটি মাত্র মানুষের ওপর—তাঁর বেদনা আর স্বপ্নের অপরাজেয় ও আগ্রাসী উদ্যমের ওপর—সেই বেদনা ও গন্তব্যের জন্যে প্রেমিকের মতো, জন্মান্ধের মতো আত্মধ্বংসীর মতো তাঁর ঝাঁপিয়ে পড়ার ওপর। আলাদাভাবে সমষ্টির চলা বলে কিছু নেই। 'আসুন আমরা সবাই আজ থেকে দেশোদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়ি'—কথাটার অর্থ একটাই : 'ভাইসব, আপনারা যে-যার মতো বাড়ি গিয়ে ভালো করে ঘুম দেন। আমাদের কারো কিছু করার দরকার নেই।'

আমাদের প্রত্যেকটি সংগঠনের মধ্যে বেশ কিছু করে সংশপ্তক মানুষ আছেই। তারা প্রায় আত্মঘাতী পর্যায়েই কাজ করে। না হলে সংগঠন জন্ম নিতে বা চলতে পারত না। কিন্তু এঁদের সংখ্যা খুবই অল্প, আগেই বলেছি : বিশজনে একজন বা দুজন। আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি সংগঠনে বিশজনের কার্যকরী পরিষদে এমনি দুজন মানুষ অন্তত পাওয়া যায় যারা জীবন বাজি রেখে সংগঠনের জন্যে আত্মহুতি দেয়; কিন্তু বাকি অপদার্থদের নিষ্ঠুর বৈরিতার কারণে তারা শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। তারা যখন জীবন বিসর্জন দিয়ে, অন্ধের মতো আত্মবিস্মৃতের মতো কাজ করে; তখনই ঐ কদর্য, অক্ষম বিকলাঙ্গেরা দূরে বসে মৃদু মৃদু হাসে। তাদের কথায় বিদ্রূপ আর তাচ্ছিল্য : 'কর্, কর্, ভালো করে কাজ করে কিছু একটা বানা। পরে বুঝবি আমরা কী পারি।' ঐ বোকা প্রাণবন্তেরা নিজেদের মূল্যহীন শ্রমে-রক্তে যখন কিছু-একটা ফল আয়ত্তে আনে (কীই বা পারে তারা, সামান্য দুটো মানুষের শ্রমে কীই বা হয়) তখন ঐ হীন চক্রান্তকারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ঐ দুজনকে ঐ সংগঠন থেকে বের করে দেয়। অক্ষমের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সক্ষমের কার্যকারিতাকে ব্যর্থ করে ফেলে। তখন ঐ দুই নির্বোধ সংখ্যালঘিষ্ঠ নিজহাতে নিজেদের দুই কান ধরে জন্মের মতো প্রতিজ্ঞা করে : 'পৃথিবীতে আর যা-ই করি সংগঠন করার মতো বেকুরি আর করব না।' কেন যে তারা সংগঠন করতে এসেছিল সেই মূঢ়তার কথা স্মরণ করে নিজেদের বুদ্ধিকে তারা ধিক্কার দেয় ও চিরদিনের জন্যে সংগঠন ছেড়ে চলে যায়। তাদের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সংগঠন চিরমৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

এখন আমার প্রশ্ন : মাত্র দুজনই যদি কাজ করল তবে সংগঠনের মধ্যে এত মানুষের অযথা ভিড় কেন? ভিড় নাহয় তবু মানলাম, কিন্তু তাদের এত অধিকার

কেন? কেন তা এতটাই বেশি যে সংগঠনের মূল ভিত্তিই তা ধ্বংস করে দেয়? অযোগ্যতাকে কি এত অধিকার দেওয়া উচিত? কী দিয়েছে তারা সংগঠনকে?

আমাদের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে এই জাতির ভেতর যার সাফল্য উজ্জ্বল হয়ে চোখে পড়ে সে 'সমষ্টি' নয়, 'ব্যক্তি'। এই জাতিতে 'ব্যক্তি' শ্রীচৈতন্য বা রবীন্দ্রনাথের মতো বড় মাপের মানুষ পর্যন্ত হয়েছে। যোগ্য ও প্রতিভাবান মানুষেরা এদেশে এককভাবে যে-বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়েছে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিগুলোর সঙ্গেই তা তুলনীয়। কিন্তু আমাদের এয়াবৎকালের ইতিহাসে সমষ্টিগত কোনো সাফল্যই প্রায় দেখা যায়নি। আমাদের জাতির 'সমষ্টি' চিরকালই দুর্বল, নিঃস্ব ও আত্মঘাতী। সমষ্টিগত কর্মকাণ্ডগুলোতে-যে ব্যক্তিপ্রতিভারা কখনো এগিয়ে যায়নি তা নয়, কিন্তু এই সংখ্যাগরিষ্ঠের শ্বাসরুদ্ধকর অযোগ্যতার চাপের নিচে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। আমার বক্তব্য, ব্যক্তিপ্রতিভার কাছ থেকেই যদি আমরা অতীতে পরীক্ষিত সাফল্য পেয়ে থাকি তবে সংগঠনের ব্যাপারেও কেন আমরা ব্যক্তির ওপর বেশি নির্ভর করছি না? কেন এমন সংগঠন গড়ে তোলার কথা ভাবছি না যেখানে মূল নেতৃত্ব দেওয়া হবে সুযোগ্য ব্যক্তিপ্রতিভাকে, অন্যদের ওপর থাকবে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতার ভার। (আমাদের দেশের সফল সংগঠনগুলোতে কি আসলে তা-ই ঘটছে না?) কেন আমরা কেবল অপদার্থ সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্তৃত্বকে এভাবে সার্বভৌম করে তুলছি, যার ফলে সংগঠনগুলোতে কেবলি অক্ষমের স্বৈরাচার সৃষ্টি হচ্ছে এবং তার হীনমন্যতাদুষ্ট অযোগ্যতা ও ক্ষুদ্রতার চাপে উচ্চতরের নেতৃত্ব ক্রমাগতভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে?

আমাদের সংগঠনগুলোকে বাঁচাতে হলে সংগঠনের ভেতরকার যোগ্য, উদ্যমশীল আত্মোসর্গিত ঐ ছোট্ট ব্যক্তি প্রতিভাদের আজ আমাদের বাঁচাতেই হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের সংগঠনের যা ভরসা তা অক্ষম সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় সক্ষম সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমাদের সংগঠনগুলোর ভেতর এদের সংখ্যা খুবই কম। সংগঠনের ভেতর তাদের যথাযথ সুরক্ষা দিতে পারলে তবেই আমাদের সংগঠনগুলো শুধু শক্তিমান হতে পারে। তাই সংগঠনের মধ্যে তাদের নিরাপত্তা ও কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ করা প্রয়োজন।

এমন সাংগঠনিক কাঠামো আমাদের আজ গড়ে তুলতে হবে যেখানে ঐ স্বল্পসংখ্যক সমর্থ মানুষ চারপাশের বিপুলসংখ্যক অক্ষমের নেতিবাচক অভিশাপ এড়িয়ে বেঁচে থাকতে পারে ও সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে। এজন্যে আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলোর কাঠামোকে সামান্যভাবে পুনর্বিন্যাস করে তাকে এইসব সুযোগ্য ব্যক্তিপ্রতিভার অনুকূলে নিয়ে আসতে হবে যদি সত্যি সত্যি আমরা সংগঠনগুলোকে অর্থবহ করতে চাই। না হলে সংগঠনগুলোর নৈরাজ্যকে আমরা এড়াতে পারব না।

সংসদীয় বনাম রাষ্ট্রপতিপদ্ধতির গণতন্ত্র

আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান ব্যক্তিনির্ভর রাষ্ট্রপতিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। হঠাৎ করে এটা তিনি করেননি। ব্রিটিশ সংসদীয় গণতন্ত্র তাঁর সামনে আবাল্য ছিল একটি সুসভ্য জাতির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরীক্ষিত প্রতীক। এই ধারার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল কুসংস্কারের মতো। প্রথমে তিনি সেই ধারাটিকেই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু একসময় টের পেয়েছিলেন আমাদের বাস্তবতা এর অনুকূল নয়। গণতন্ত্রের জন্যে দরকার নেতা ও জনগণের মধ্যে উঁচু মাপের মূল্যবোধ। এটাই গণতন্ত্রের আসল শিরদাঁড়া। আমাদের নেতৃত্বের মধ্যে এই মূল্যবোধ খুবই নিচু পর্যায়ের। তাই বল্গাহীন ও স্বার্থলোলুপ কায়েমি স্বার্থকে পাশ কাটিয়ে জনগণের সত্যিকার কল্যাণ করতে চাইলে এবং ক্ষিপ্রগতিতে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিতে চাইলে এই পদ্ধতির চেয়ে রাষ্ট্রপতিকেন্দ্রিক ব্যবস্থা বেশি ফলপ্রসূ। তাই তিনি এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী সামরিক শাসকেরা এই পদ্ধতির সুবিধাগুলোকে পুরোপুরি তাদের অনুকূলে ব্যবহার করেছিল। তারা সামরিক শাসনকে এতদিন পর্যন্ত যে এত শক্তভাবে এবং যোগ্যতার সঙ্গে টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল তা এই পদ্ধতির কারণেই। এর জন্যে তাদের খুব বেশিকিছু করতে হয়নি। সংবিধানে 'রাষ্ট্রপতির আদেশ'গুলোকে 'সামরিক শাসকের আদেশ' নামকরণ করেই তারা এই সুবিধাটা পুরোপুরি নিজেদের অনুকূলে হাতিয়ে নিতে পেরেছিল। এরশাদের দীর্ঘ দুর্নীতিপরায়ণ শাসনামলের শেষদিকে জনগণ তাঁর ওপর এমনভাবে অসন্তুষ্ট এবং বিরক্ত হয়ে ওঠে যে শেষপর্যন্ত গণআন্দোলনের মাধ্যমে তারা তাঁকে উৎখাত করে জেলে পাঠায়। তাঁর ঘৃণ্য শাসনামলের সবকিছুর মতোই তাঁর ঘৃণিত ও কলঙ্কিত স্মৃতিবিজড়িত রাষ্ট্রপতি-পদ্ধতিকেও জনগণ ভালোভাবে পরীক্ষা ছাড়াই নির্বাসন দেয়।

আজ আমাদের দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চলছে। এই ব্যবস্থা থেকে আমাদের খুব একটা সুফল পাওয়ার কথা নয়। আমরা তা ঠিকমতো পচ্ছিও না। অধিক সংখ্যক দুর্বৃত্ত ও অক্ষমের শাসনের ফলে গণতন্ত্রের আসল চেহারাটা আজ অরাজক ও অকার্যকর হয়ে পড়েছে। আমরা এত মানুষের ভিড় থেকে শাসকের প্রকৃত মুখ—যার নাম ন্যায়পরায়ণতা—খুঁজে পাচ্ছি না। ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে রয়েছে দুর্বল ও অসহায়। তবু-যে কিছু সুফল এর থেকে আমরা এখনো পাচ্ছি তা এজন্যে যে

খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনা দুজনের কেউই আসলে গততান্ত্রিক উপায়ে দেশ শাসন করছেন না। তাঁরা দেশ চালাচ্ছেন বংশানুক্রমিক নৃপতিদের মতো। সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির একজন সরকারপ্রধান যতটা ক্ষমতার অধিকারী হন তাঁরা ক্ষমতা উপভোগ করছেন তার চেয়ে অনেক বেশি; এমনকি রাষ্ট্রপতি-পদ্ধতির সরকারপ্রধানের চাইতেও বেশি পরিমাণে (যা সংসদীয় পদ্ধতির গণতন্ত্রের জন্যে পরিণামে খুবই বিপজ্জনক)। এর কারণ : তাঁদের ক্ষমতা যোগ্যতাগত নয়, উত্তরাধিকারগত। দলের ভেতর তাদের বিকল্প নেই। তাঁরা দলের ঈশ্বর নির্দিষ্ট বিধিলিপি ও অনিবার্য নিয়ন্তা। তারা একই সঙ্গে দলরূপ প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক। নিজ নিজ দল বা জনগণ কারও কাছে তাঁদের প্রায় কোনো জবাবদিহিতা নেই। যখন যা-খুশি তা তাঁরা করতে পারেন এবং তাঁদের হাতে জিম্মি তাঁদের নিজ নিজ দল এবং দেশবাসীকে দিয়ে তা অনুমোদন করিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন এই 'স্বৈরাচারীদের' যুগের অবসান ঘটবে, সরকারপ্রধানের ক্ষমতা অনেকখানি কমে আসবে, তখন শতদলে বিভক্ত আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি এই সংসদীয় পদ্ধতিতে কতটা দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দেশ চালাতে পারবে তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। যদি সেটা সত্যি সত্যি কঠিন হয় তখন অবশ্য রাষ্ট্রপতি-পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়াই হবে আমাদের জন্যে সুবিবেচনার কাজ।

আমি সব সময় লক্ষ করে আসছি যে আমরা স্বপ্ন দেখি গণতন্ত্রের, কিন্তু স্বস্তি বোধ করি একনায়কতন্ত্রে। এর কারণ অনেক। তবে ঐতিহাসিক কারণটি হল দেড় হাজার বছরের রাজতন্ত্রের অবসান আমাদের মাত্র পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা। রাজা রয়ে গেছে আমাদের অস্থিমজ্জায়। এই রাজতন্ত্র থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রে যদি আমাদের যেতেই হয় তবে যাবার পথে রাষ্ট্রপতি-পদ্ধতির একটা অন্তর্বর্তী অধ্যায় আমাদের পার করে নেওয়া উচিত বলেই আমার মনে হয়। এই উত্তরণের প্রক্রিয়াটি হওয়া উচিত সুস্থির ও সুচিন্তিত। এই মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি শাসনের অনুকূলে কিছু যুক্তিও আছে। রাষ্ট্রপতি-পদ্ধতির শাসকের চেহারা আমাদের জনগণের মনের অনেক কাছাকাছি। ব্যক্তি-মানুষকে আমরা সহজে চিনতে পারি। যুগযুগ ধরে রাজতন্ত্রে অভ্যস্ত থাকায় এতেই আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি বেশি। এখনো কোনো ন্যায়বিচার বা অন্যায়ের প্রতিকার পেতে চাইলে সরকার বা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনযন্ত্রের বদলে মন্ত্রী বা সরকারপ্রধানের কাছ থেকেই আমরা বেশি সুবিচার পাবার স্বপ্ন দেখি। তাছাড়া প্রকৃতপক্ষে আজও তো ব্যক্তিশাসনই চলছে এদেশে। ইংল্যান্ডের মতো বুর্জোয়া বিকাশের হাত ধরে ও শতাব্দীর পর শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আমরা রাজতন্ত্র থেকে একটু একটু করে সংসদীয় গণতন্ত্রের দিকে পরিণত হয়ে উঠিনি। হঠাৎ এর ভার আমাদের কাঁধের ওপর চাপিয়ে দিলে একে আত্মস্থ ও কার্যকর করব কীভাবে? আচমকা রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির কথা বললে আমাদের দেশের সবাই কিছুটা চমকে ওঠেন। এর কারণ, রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের

অজ্ঞতা। এদেশে দুশো বছর ব্রিটিশ-শাসনের কারণে ব্রিটিশ সংসদীয় গণতন্ত্রের বাইরে আর-কোনো সরকারপদ্ধতির সঙ্গে আমাদের সরাসরি পরিচয় নেই। তাই আমরা অনেকে ভাবতেও পারি না যে গণতন্ত্রের আরও বেশ কিছু কার্যকর পদ্ধতি থাকতে পারে। আমরা আজ ভাবতেও পারি না যে অন্তত একান্ন ভাগ ভোটে জয়লাভ-করা রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করা পার্লামেন্ট বা কংগ্রেসসম্পন্ন ফরাসি বা আমেরিকান ধাঁচের রাষ্ট্রপতিব্যবস্থা আমাদের জন্যে অনেক বেশি সুবিধাজনক—বিশেষ করে ফরাসি-পদ্ধতি, যেহেতু মনমানসিকতার দিক থেকে আমরা ব্রিটিশ বা আমেরিকানদের চেয়ে ফরাসিদেরই বেশি কাছাকাছি।

আমার এই বক্তব্যকে হঠাৎ করে উটকো মনে হতে পারে, কিন্তু ভালো করে তাকালেই বোঝা যাবে সংসদীয় গণতন্ত্র আজ আমাদের দেশে কী উদ্ধারহীন সংকটের মধ্যে পড়েছে। এর আওতায় আমাদের রাষ্ট্র কীভাবে ক্রমাগত নেতিবাচক ও সংঘাতপূর্ণ হয়ে পড়েছে। আমাদের কোনো রক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। উন্নয়নের চাকা উল্টোদিকে ঘুরছে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, প্রতিশোধপরায়ণতা আর নৈরাজ্যকে প্রতিহত করার পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নিরাপত্তাহীনতা ও অন্ধকার ক্রমশ বাড়ছে। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে দীর্ঘস্থায়ী স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নয়। আগেই বলেছি, রাষ্ট্রপতি-পদ্ধতি আমাদের জন্যে আরও উপযোগী একারণে যে এই পদ্ধতি গণতান্ত্রিক হলেও এতে সরকার প্রধানের থাকে বেশ কিছু বাড়তি ক্ষমতা। আমাদের শাসককে গড়পড়তা শাসকদের চাইতে কিছুটা বাড়তি ক্ষমতা আজ আমাদের দিতে হবে। না হলে আমাদের উচ্ছৃঙ্খল ও স্বার্থলোলুপ প্রবণতাগুলোকে প্রতিহত করা কঠিন হবে। অক্ষম ও বিশৃঙ্খল জাতির জন্যে শক্তিশালী শাসকই যুক্তিযুক্ত। আজ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোকে দ্রুত গতিতে বড় ধরনের সংস্কারের আওতায় এনে বেগবান করতে না-পারলে বিশাল জনসংখ্যা-অধ্যুষিত এই দরিদ্র জাতির বিপর্যয় ঠেকানো কঠিন হবে।

আর-একটি কারণে রাষ্ট্রপতি-পদ্ধতিকে উপযোগী বলে মনে হয়। সারাদেশের ভেতর থেকে একজন যোগ্য মানুষকে খুঁজে বের করা সংসদীয় গণতন্ত্রের বহু-নেতাভিত্তিক বিশাল শাসকবহরকে শনাক্ত করার চেয়ে সহজতর। একজন যোগ্য, সৎ ও শক্তিমান মানুষের শাসনও বিপুলসংখ্যক বিশৃঙ্খল স্বল্পযোগ্যতাসম্পন্ন অসৎ মানুষের শাসনের চেয়ে ভালো। আমার ধারণা, ভুল করেই আমরা রাষ্ট্রপতিব্যবস্থা থেকে সংসদীয় ব্যবস্থায় ফিরে এসেছি। এই ব্যবস্থায় গণতন্ত্র, সংসদ, এমনকি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেভাবে মুখ থুবড়ে পড়ছে তাতে স্বৈরতন্ত্রের উত্থান ঠেকাতে চাইলে বা গণতন্ত্রের ভেতর জনগণকে সুশাসন দিতে চাইলে হয় রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার, নাহয় অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ভিত্তিক সংসদীয় গণতন্ত্রের বিষয়টি নিয়ে

আমাদের ভাবা উচিত।

আমার ধারণা কেবল রাষ্ট্র সংগঠনকে নয়, দেশের সব সংগঠনগুলোকে সুযোগ্য ব্যক্তি নেতৃত্বের ভিত্তিতে গড়ে তোলা সম্ভব হলে তা আমাদের জন্যে লাভজনক হবে।

ব্রিটিশ আমলের দুইশ বছরে ব্রিটিশ সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের নিবিড় পরিচয় ঘটেছিল। আমরা অনেকেই অনেক কারণে একে গণতন্ত্রের একমাত্র রূপ বলে ভেবেছি ও এই ভাবনায় বিশ্বাসী হয়ে রয়েছি। গণতন্ত্রের যে আর কোনো কার্যকর রূপ থাকতে পারে তাও আমাদের অনেকের স্পষ্টভাবে জানা নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে রাষ্ট্রপতিপদ্ধতির গণতন্ত্র সংসদীয় গণতন্ত্রের মতো একইরকম ফলপ্রসূ একটি পদ্ধতি এবং আমেরিকা ও ফ্রান্সের মতো দুটি উন্নত দেশ এই গণতান্ত্রিক কাঠামোতেই নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। কেবল তাই নয়, ফ্রান্সের মতো একটি বিশৃঙ্খল দেশকে এই পদ্ধতি এক ভয়াবহ সাংবিধানিক সংকট থেকে বাঁচিয়েছিল। অনেকে যুক্তি দেখান রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি থাকলে সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভবনা বেড়ে যায়। কথাটা আদৌ ঠিক নয়। ফ্রান্স বা আমেরিকায় সামরিক অভ্যুত্থান কি ঘটে? জনগণ যদি শক্তিশালী হয় তবে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে পারে না। আর জনগণই যদি দুর্বল হয়ে পড়ে কে সামরিক অভ্যুত্থান ঠেকাবে? ১৯৭৫-এর রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিকে উচ্ছেদ করেই কি এদেশে শুধু সামরিক শাসন এসেছে, ১৯৫৮ সালে সংসদীয় গণতন্ত্রকে উচ্ছেদ করেও কি ঐ শাসন আসেনি? আসলে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা লক্ষ্যহীনতা ও দুর্বলতার কারণেই একটি জাতি সামরিকতন্ত্রের সহজ শিকার হয়ে পড়ে, কোনো বিশেষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কারণে নয়।

আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর রূপরেখা

আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে এমনি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির আদর্শে সভাপতি ভিত্তিকভাবে গড়ে তুতে পারলে সংগঠনগুলোর সংহতি ও কর্মক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যাবে বলে আমার ধারণা। বর্তমানে দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো এদের কার্যকরী কমিটির ভেতরকার ক্ষমতার দ্বন্দ্বে প্রায়ই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কমিটিগুলোতে ক্ষমতার দুটো শক্তিশালী ভিত্তি আছে : সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। প্রায়ই দেখা যায় এদের একজন কার্যকরী কমিটির কিছু সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে অন্যজনকে কমিটি থেকে বহিষ্কার করে দেন ও তার পাল্টা ব্যবস্থাস্বরূপ অন্যজনও একই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। উভয় দলের এই বহিষ্কার প্রতিবহিষ্কারের ঘটনা নানান মুখরোচক কাহিনী হিসেবে খবরের কাগজগুলোয় প্রকাশিত হয় এবং অনেক সময় এই বিরোধ আদালত পর্যন্ত পৌঁছোনোর পরিণতিতে সংগঠনের কার্যক্রমই মুখ থুবড়ে পড়ে।

আমার ধারণা এসব সংগঠনে ক্ষমতার ভিত্তি দুটো না হয়ে যদি একটা হত এবং সাধারণ সদস্যদের ন্যূনপক্ষে একান্ন ভাগ ভোটে নির্বাচিত সভাপতি যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে ক্ষমতায় আসতেন তবে এ ধরনের দ্বন্দ্বের পরিমাণ যেমন কমে যেত তেমনি সভাপতি অনেক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিজের কাজ সম্পাদন করতে পারতেন ও ভবিষ্যতের নির্বাচনের কথা ভেবে অনেক বেশি যোগ্যতা ও সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে বাধ্য হতেন। এরকম অবস্থায় তার কার্যপরিষদের সভ্যেরা সাধারণ সভ্যদের ভোটে নির্বাচিত না হয়ে হবেন তাঁর দ্বারা মনোনীত। অর্থাৎ তারা হবেন সভাপতির আরাধ্য কাজ সম্পাদনে তার সহযোগী। এ ধরনের ব্যবস্থায় সভাপতি নির্বাচিত হতে হবে দুই দফায়। প্রথম দফায় যে-কেউ সভাপতি পদের জন্যে দাঁড়াতে পারবেন। দ্বিতীয়বারের প্রথম দফায় যে দুজন সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন কেবল তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় সংগঠনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পদ্ধতি এমনি। আমার ধারণা আমাদের রাষ্ট্রীয়

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর জন্যে পদ্ধতিটি খুবই উপযোগী হবে। আমাদের মূল্যবোধের মান যদি ব্রিটিশদের মতো উন্নত হত তবে আমাদের বর্তমানের সংগঠন কাঠামো দিয়েই কাজ চলে যেতে। কিন্তু তা নয় বলে আমাদের সাংগঠনিক উদ্যোগগুলো কেবলই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। আমার ধারণা আমাদের মূল্যবোধের যে মান তা নিয়েও সভাপতি নির্ভর সংগঠনে আমরা বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশি সাফল্যের পরিচয় দেব।

সংগঠনের উত্তরাধিকার

বাংলাদেশে সংগঠন গড়ে তোলা এমনিতেই কঠিন। যদিবা কেউ মেরে কেটে একটা সংগঠন তৈরিও করে তবু সেটা মরে যায় অন্য একটা কারণে : ঐ সংগঠনে তার উত্তরাধিকারী পাওয়া যায় না বলে। আমার ধারণা, উত্তরাধিকারের সংকট আমাদের সংগঠনগুলোর সবচেয়ে মারাত্মক সংকট। সংগঠনগুলোর স্থায়িত্বের সবচেয়ে বড় অন্তরায় এই ব্যাপারটিই। এ যাবৎ আমাদের দেশের অধিকাংশ সংগঠনের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়নি, সহসাই পাওয়া যাবে এমন আশাও কম। অনেকে সমালোচনা করে বলেন, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতারা তাদের উত্তরাধিকারী গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী নন, তাই এদের পাওয়া যায় না। তাঁরা নিজ নিজ সংগঠনে এমন নিরঙ্কুশ ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব কায়েম করে রাখেন যে সেই কঠোর জাল ভেদ করে অন্য কেউ ওপরে উঠে আসতে পারে না।*

আমার কাছে কথাটাকে যথাযথ বলে মনে হয় না। একজন সংগঠক কোন এটা চাইবেন যে জীবনকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে গড়ে তোলা তাঁর সংগঠনটি তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। একটি সংগঠন তো এর প্রতিষ্ঠাতার কাছে সন্তানের মতো। তাছাড়া সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতারা তো মেধাহীন মানুষও নন। গ্লাডিয়েটারদের মতো জীবনের সঙ্গে রক্তাক্ত সংগ্রাম করে, চারপাশকে ওলট্‌পালট করে একেকটি সংগঠন তাঁদের ছিনিয়ে আনতে হয় চারপাশের বিরুদ্ধ পৃথিবী থেকে। ধৈর্য, মেধা, শক্তি, বুদ্ধিমত্তা, সাহস, বিজিগীষা, অধ্যবসায় ও অদমিত আগ্রাসী মনোভঙ্গি—এমন অসংখ্য গুণের দরকার হয় তাদের এটা করতে। এত

---

* অবশ্যি একটা কথা মানতে হবে একটি সংগঠন যার হাতে তৈরি হয় তার আমলে ঐ প্রতিষ্ঠানে একধরনের এককেন্দ্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে। এটা খারাপ কিছু তো নয়ই বরং সংগঠনটির বিকাশের অনুকূল। এই কর্তৃত্বের ভেতর দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির স্বপ্ন সুসংহত এবং ভিত মজবুত হয়। এখানে প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকা থাকে বেনেভোলেট ডিক্টেটরের মতো। প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর সর্বোচ্চ অঙ্গীকার, বেদনা ও মমত্ববোধ থাকে বলে এই একক কর্তৃত্ব দিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠানটিকে স্থায়ী করে তুলতে পারেন। যেখানে এমনটা হয় না, সেখানেই বরং অকালে ঐ প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু হয়।

দিকে যাঁরা যোগ্যতার পরিচয় দেন কেবল উত্তরাধিকারী গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁরা সবাই বোধবুদ্ধিহীন এটা মানা কঠিন।

যদ্দুর মনে হয় এই ব্যর্থতার মূল রয়েছে আমাদের জাতীয় মনস্তত্ত্বের গভীরে। আমার ধারণা আমাদের গড়পড়তা মানুষের আত্মস্বার্থসর্বস্ব মনোভঙ্গির কারণেই আমাদের সংগঠনগুলোতে উত্তরাধিকারী গড়ে ওঠে না এবং গড়ে উঠলেও তাকে সবাই মিলে আমরা মেরে ফেলি।

আগেই বলেছি এদেশে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাটাই একটা অসাধ্য ব্যাপার। মাঝারি শক্তির মানুষ দিয়ে এ সম্ভব হয় না। এদেশে কেউ নিজেকে কারো চেয়ে কম মনে করে না (সত্য এর যত বিরুদ্ধেই হোক)। তাদের সমকক্ষ বা সামান্য বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন একজন মানুষ কোনোকিছু তৈরি করে তাদের ওপর কর্তৃত্ব ফলাবে এটা তারা মেনে নেয় না। তাই সবাই মিলে তাকে ধ্বংস করে ফেলে। এজন্যেই এদেশের অধিকাংশ সংগঠন মুকুলিত হতে-না-হতেই ঝরে যায়। এদেশে তখনই একটি সংগঠন গড়ে ওঠে ও তা বেঁচে থাকে যখন এমন কেউ তার উদ্যোগ নেন যিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের অন্যদের তুলনায় অপরিমেয়রকমে বেশি শক্তিমান। সে শক্তি এতটাই যে সবার মিলিত ষড়যন্ত্র ও হীনতার আঘাতকে ছিন্ন করে নিজেরে নিরঙ্কুশ অবস্থানকে সুসংহত করে তা জেগে থাকতে পারে। অর্থাৎ নিজের চারপাশে এমন একটা দুর্ভেদ্য বলয় তৈরি করে নিতে পারে যার সামনে দাঁড়িয়ে মাঝারি ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষেরা বিমূঢ় ও অসহায় হয়ে পড়ে এবং ঐসব চেষ্টাকে পুরো নিরর্থক টের পেয়ে নিরস্ত্র হয়ে যায়। আমাদের দেশে যাঁরা আজ পর্যন্ত সাংগঠনিক সাফল্য দেখিয়েছেন, তারা সবাই এই জাতের। মাঝারি মানুষের পক্ষে সংগঠন গড়ে তোলা বা এর উত্তরাধিকারী হওয়া ও সাফল্যের সঙ্গে সেই সংগঠন চালিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন।

অথচ একটি সংগঠনের উত্তরাধিকারীদের তো মাঝারি ক্ষমতার মানুষই হবার কথা। সবদেশেই তো ব্যাপারটা তাই। ইয়োরোপের মানুষ কিন্তু এই কাজটি খুব সহজেই করতে পারে। যেখানে দশজন মানুষের ভেতর থেকে নেতা নির্বাচনের দরকার হলে কে তাদের মধ্যে 'তুলনামূলকভাবে ভালো' তারা তাকে অনায়াসে শনাক্ত করে নিতে পারে এবং একবার কাউকে সেই পদে নির্বাচন করে ফেললে পারতপক্ষে তার বিরোধিতা করে না। যুগ যুগ ধরে নির্মম প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে বাঁচতে হয়েছে বলে নেতা-নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের রয়েছে এই সহজাত ক্ষমতা। কিন্তু সংগঠনের অতীত অভিজ্ঞতা-না থাকায় ব্যাপারটি আমাদের ঠিক মজ্জাগত নয়। নিজের চেয়ে কাউকে বড় ভাবতে আমরা খুবই অনিচ্ছুক। ফলে সেই 'তুলনামূলকভাবে শ্রেয়'কে নেতা বলে মেনে নিতে তার নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করার কথা আমরা একেবারেই ভাবতে পারি না। সংগঠনের এমনকি নিজের উচ্চতর স্বার্থের কারণেও না। তখনই আমরা একজনকে মানি যখন সে

আমাদের চেয়ে হয়ে পড়ে 'তুলনাহীনরকমে বড়'—এমন কোনো উৎস থেকে আসা যার নাগাল পাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু অত তুলনাহীন মানুষ আমরা কোথায় পাব? থাকলেও তারা তো একট তৈরি-হওয়া প্রতিষ্ঠানের হাল ধরার জন্যে আসবে না, নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্যেই বরং উদ্যোগী হবে।

আমার ধারণা, এজন্যেই মাঝারি মানুষের পক্ষে এদেশে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা বা সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকারী হওয়া দুটোই কঠিন। কেবল একটি উপায়ে এদেশে প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকারী হতে পারা সম্ভব—যদি সে-ব্যক্তির অস্তিত্বকে ঘিরে কোনো অলৌকিকের সহযোগ থাকে; অর্থাৎ তিনি যদি গড়পড়তা মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে হন। কয়েক রকমভাবে এটা সম্ভব। এক. তিনি যদি অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন হন ও হয়ে পড়েন সকলের নাগালের অতীত কোনো অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব তা হলেও এটা হতে পারে। তিনি তখন হয়ে ওঠেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝির হোসেন মিঞার মতো অসাধ্যের বাস্তবায়নকারী এক রহস্যময় শক্তি যার সামনে সংগঠনের বাকি সবার মেধা হয়ে পড়ে বিমূঢ় ও অসহায়। দুই. তিনি যদি পিতামাতার সূত্রে হন ঐ প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী অর্থাৎ এমন কেউ হন যিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সভ্যদের থেকে নিয়তি-নির্ধারিতভাবেই আলাদা। তাঁর এই অবস্থানটিও জাগতিক উপায়ে আয়ত্ত করার উপায় নেই। এখানের ব্যক্তির উদ্ভবকে ঘিরে রেখেছে অলৌকিকতার সহযোগ। আমাদের দেশে যেসব সংগঠন মোটামুটি টিকে আছে তাদের অনেকের ইতিহাসই এমনি। আমাদের দেশের প্রাচীন গল্প থেকে রাজা-নির্বাচনের একটা প্রথা সম্বন্ধে জানা যায়। রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেছেন, নতুন রাজা চাই। একটা হাতি নামিয়ে দেওয়া হল রাস্তায়। সে হাতি যাকে নিজের পছন্দে পিঠে তুলে নিয়ে আসবে, সেই হবে রাজা। এখানেও শাসকের উৎসের জায়গায় রয়েছে সেই দৈবী ব্যাপার। ব্যক্তিটি বিদেশি (বিশেষভাবে শ্বেতাঙ্গ) হলেও, উৎসের অসামান্যতার কারণে, আমরা তাকে মেনে নিই। যুগ যুগের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনে ফেলেছি, এরা প্রভুর জাত, এরা থাকলে আমাদের নিজ নিজ নেতৃত্বের দাবিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা ছাড়া উপায় নেই। আমাদের যত আপত্তি কেবল নিজেদের বেলায়।

২০০২